অ্যানিমেল ফার্ম

জর্জ অরওয়েল

সেবা
প্রকাশনা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Edited By - Sewam Sam
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited BY Sewam.Sam
Edited BY Sewam.Sam
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

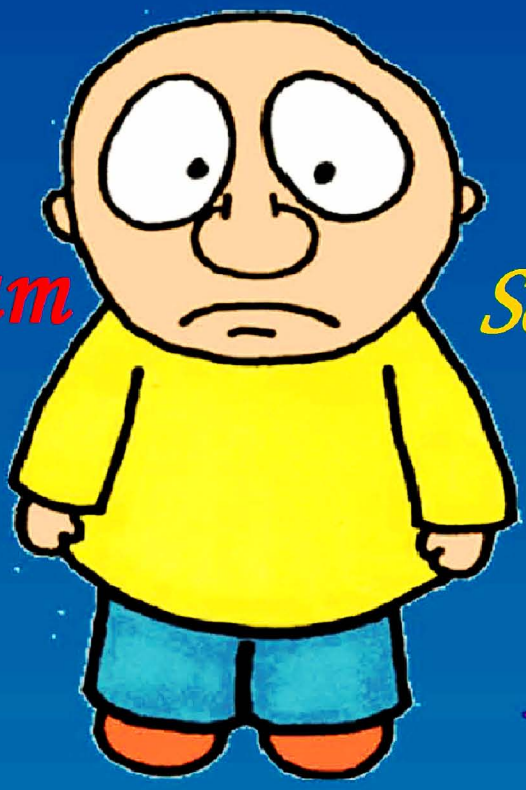

অ্যানিমেল ফার্ম

মূল: জর্জ অরওয়েল

রূপান্তর: সুরাইয়া আখতার জাহান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

'ম্যানর ফার্মের' মালিক মি. জোনস মাতাল অবস্থায় মুরগির খাঁচার দরজা বন্ধ করলেন। কিন্তু পপ-হোলগুলো বন্ধ করতে ভুলে গেলেন, লণ্ঠন হাতে টলতে টলতে রান্নাঘরের মদের পিপে থেকে এক গ্লাস বিয়ার ঢেলে রওনা হলেন শোবার ঘরের দিকে। মিসেস জোনস তখন বিছানায় নাক ডাকাচ্ছেন।

শোবার ঘরের আলো নিভতেই সারা খামার জুড়ে শুরু হলো চিৎকার আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। ক'দিন আগে খামারের বুড়ো শুয়োর মেজর একটা স্বপ্ন দেখেছে। সে তার স্বপ্নের কথা জন্তুদের শোনাতে চায়। ঠিক হয়েছে মি. জোনসকে কোনমতে ফাঁকি দিতে পারলেই সবাই বার্নে সমবেত হবে। বুড়ো মেজরকে (এই নামেই সে সবার কাছে পরিচিত, কিন্তু সে প্রদর্শনীতে নামত 'উইলিংডন সুন্দরী' নামে) সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাই রাতের এক ঘণ্টা ঘুম কামাই করে তার কথা শুনতে কেউ অমত করেনি।

বার্নের শেষ মাথায় উঁচুমত একটা প্ল্যাটফর্ম, তার ওপরে কাঠের বরগার সাথে বাঁধা একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনের নিচে খড় বিছিয়ে মেজরের জন্য বিছানা তৈরি হলো। মেজরের বয়স বারো, বয়সের সঙ্গে একটু মুটিয়ে গেছে দেহ। কিন্তু এখনও সে যথেষ্ট সুন্দরী, সব সময় চুপচাপ থাকে বলে বিজ্ঞ মনে হয় তাকে। জন্তুরা একে একে বার্নে জড়ো হতে শুরু করল। নিজ নিজ ভঙ্গিতে আরাম করে বসল সবাই। প্রথমে এল তিনটে কুকুর—ব্লুবেল, জেসী আর পিনশার। এরপর এল শুয়োরের দল, তারা দখল করল মেজরের সামনের খড় বিছানো জায়গা।

মুরগিরা বসল উইণ্ডোসিলে, কবুতরগুলো ছাদের বরগায় বসে ডানা ঝাপটাতে লাগল। ভেড়া আর গরুর পাল শুয়োরদের পেছনে শুয়ে জাবর কাটতে শুরু করল। লাঙ্গলটানা ঘোড়া বক্সার আর ক্লোভার এসে খুব সাবধানে বিশাল পা গুটিয়ে বসল যাতে খড়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা খুদে কোন প্রাণী ব্যথা না পায়। ক্লোভার মাঝবয়সী মোটাসোটা মাদী ঘোড়া, তবে চতুর্থ শাবকটি প্রসবের পর সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বক্সার বিশাল দেহী, যে কোন ঘোড়ার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি ধরে দেহে। নাকের ওপর সাদা দাগটা তার চেহারায় বোকা বোকা ভাব এনে দিয়েছে।

তার বুদ্ধিশুদ্ধিও আসলে তেমন নেই, কিন্তু পরিশ্রমী আর দৃঢ় চরিত্রের বলে তার সুনাম আছে। ঘোড়াদের পরে এল সাদা ছাগল মুরিয়েল, এল গাধা বেনজামিন। বেনজামিন এই খামারের সবচেয়ে পুরানো আর বদরাগী জন্তু। সে কথা বলে কম, এবং যা বলে তার সবটাই প্যাঁচালো। সে বলে, ঈশ্বর তাকে লম্বা লেজ দিয়েছেন মাছি তাড়াবার জন্য।

কিন্তু শিগ্‌গিরই তার কোন লেজ থাকবে না এবং কোন মাছিও থাকবে না। সে কখনও হাসে না, বলে—হাসার কোন কারণ দেখে না। স্বীকার না করলেও বোঝা যায়, বক্সারকে সে পছন্দ করে। রোববারে তারা দু'জনে পেছনের জমিতে নিঃশব্দে চরে বেড়ায়। মা হারা একদল হাঁসের বাচ্চা দুর্বল গলায় ডেকে ডেকে ডানা ঝাপটাচ্ছিল আর এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল, যেখানে বসলে কেউ তাদের মাড়িয়ে দেবে না।

বক্সার তার বিশাল পা দিয়ে একটা দেয়াল বানিয়ে দিল। হাঁসের বাচ্চারা সেই দেয়ালের ভেতর এসে বসল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল। এরপর এল মলি, বোকা-সুন্দরী ঘোড়া; তাকে মি. জোনস ফাঁদ পেতে ধরেছিলেন। সে এল সুস্বাদু চিনির দলা চুষতে চুষতে। সামনের দিকে বসে আনমনে ঘাড়ের কেশর দোলাতে লাগল, যাতে সবাই তার ঘাড়ের সুন্দর লাল ফিতেটা দেখতে পায়।

সবশেষে এল বেড়াল, স্বভাব মত চারদিকে তাকাল একটা উষ্ণ জায়গার খোঁজে। তারপর বক্সার ও ক্লোভারের মাঝখানের জায়গাটুকুতে চেপে বসল। মেজরের বক্তৃতা শোনার বদলে সে অনবরত মিউ মিউ করে চলল।

পোষা দাঁড় কাক মোজেস ছাড়া সবাই এসে গেছে। সে ঘুমাচ্ছিল দরজার ওপর বসে। মেজর দেখল, সবাই উপস্থিত। সে গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, 'বন্ধুরা, তোমরা সবাই আমার স্বপ্নটার কথা শুনেছ। স্বপ্নটার কথা আমি পরে বলব, তার আগে আরও কিছু কথা বলার আছে। আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, মৃত্যুর আগে আমার একমাত্র কর্তব্য হলো নিজের জ্ঞান সবার মাঝে বিলিয়ে যাওয়া। দীর্ঘ একটা জীবন যাপন করেছি আমি, অবসর সময়ে প্রচুর চিন্তা ভাবনা করেছি। জন্তুদের জীবন-যাপনের প্রকৃতি নিয়ে আমি আজ তোমাদের কিছু বলতে চাই।

'বন্ধুরা, আমাদের জীবনটা কেমন? আমাদের জীবনটা হলো দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ, আর আমাদের আয়ুও খুব কম। জন্মের পর শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য পাই আমরা। সেই খাদ্যের বিনিময়ে মানুষেরা আমাদের দিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়। কাজ করার শক্তি ফুরিয়ে গেলে কসাই খানায় বিক্রি করে দেয়। ইংল্যাণ্ডের কোন জন্তুই জন্মের একবছর বয়সের পর

থেকে সুখের মুখ দেখে না। আমাদের জীবন কেবল কষ্টের—এই হলো আসল সত্য।

'কিন্তু এটাই কি প্রকৃতির নিয়ম? ইংল্যাণ্ডের জমি কি এতই অনুর্বর যে, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যোগান দিতে পারে না?' না, বন্ধুরা। আসল ব্যাপার তা নয়, ইংল্যাণ্ডের মাটি উর্বর, আবহাওয়া চমৎকার, আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে এই মাটি। এই ফার্মেই একডজন ঘোড়া, বিশটা গরু, শ'খানেক ভেড়াকে আরও অনেক আরামে রাখা যায়; যা কল্পনারও অতীত। তবে কেন আমরা এত কষ্ট করব? আমাদের শ্রমে উৎপন্ন শস্যের সবটুকুই গ্রাস করে মানুষেরা। এক কথায় বলা যায়, মানুষ—মানুষই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শত্রু। মানুষকে সরিয়ে দাও, তাহলেই আর কোন খিদে-কষ্ট থাকবে না।

'মানুষই একমাত্র জীব, যারা কোনরকম পরিশ্রম না করেই সুখে দিন কাটায়। মানুষ দুধ দেয় না, ডিম পাড়ে না, লাঙ্গল টানে না, এমনকি খরগোশ ধরার জন্য দ্রুত দৌড়াতেও পারে না। অথচ তারাই সবার প্রভু। অন্য জন্তুদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে বিনিময়ে তাদের প্রাণ ধারণের জন্য সামান্য খেতে দেয়, বাকিটুকু গ্রাস করে নিজেরা। গরুদের বলছি, গত ক'বছরে তোমরা কত হাজার গ্যালন দুধ দিয়েছ? তোমাদের বাছুরদের শক্ত সমর্থ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য যে দুধ ব্যয় হবার কথা ছিল, কোথায় গেল সেগুলো? এর প্রতিটি ফোঁটা আমাদের শত্রুদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

'মুরগিরা, গত ক'বছরে তোমরা যতগুলো ডিম পেড়েছ, তার ক'টা থেকে বাচ্চা ফোটাতে পেরেছ? বাকি ডিমগুলো বিক্রি করা হয়েছে জোনস ও তার লোকদের পয়সার যোগান দিতে। এই যে, ক্লোভার, তোমার চারটে বাচ্চার কি হলো, যাদের কথা ছিল এই বুড়ো বয়সে তোমাকে সঙ্গ দেবার? এদের প্রত্যেককেই মাত্র এক বছর বয়সে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তুমি আর কখনোই তাদের দেখতে পাবে না। ভেবে দেখো, সারাজীবন লাঙ্গল টানার বিনিময়ে তুমি কি পেলে?

'এত কষ্টের জীবন যাপনের পরেও স্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের ভাগ্যে জোটে না। নিজের কথা বলছি না, আমি হচ্ছি সৌভাগ্যবানদের একজন যারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পেরেছে। আমার বয়স বারো, বাচ্চা প্রায় চারশো—এটাই শুয়োরদের স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু কোন জন্তুই শেষ পর্যন্ত কসাইদের ছুরির হাত থেকে রেহাই পায় না। তোমরা, যুবক শুয়োরেরা, আমার সামনে যারা বসে আছ, আগামী এক বছরের মধ্যেই সবাই মারা পড়বে। একই ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে গরু, ভেড়া, মুরগি, সবার। ঘোড়া কিংবা কুকুরদের ভাগ্যেও এর চেয়ে ভাল কিছু নেই।

'বক্সার, তোমার পেশী যেদিন দুর্বল হয়ে পড়বে সেদিন তোমাকেও কসাইদের কাছে বিক্রি করা হবে। তোমাকে টুকরো টুকরো করে তারা কুকুরের খাদ্য বানাবে। কুকুরেরা, তোমরা যখন বুড়ো হবে, দাঁত পড়ে যাবে, জোনস তখন তোমাদের গলায় ইট বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে দেবে।

'বন্ধুরা, এটা কি পরিষ্কার নয়, যে আমাদের সুন্দর জীবন-যাপনের পথে একমাত্র বাধা এই মানব জাতি? শুধুমাত্র মানুষের হাত থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের উৎপাদিত সম্পদ আমরা নিজেরা ভোগ করতে পারব। ধনী আর স্বাধীন হতে পারব। কিন্তু এখন আমাদের করণীয় কি? মানুষের সেবায় দিনরাত পরিশ্রম করে যাওয়া? না, বন্ধুরা, আমরা বিদ্রোহ করব। জানি না, কবে এই বিদ্রোহ সফল হবে, হয়তো এক সপ্তাহে, হয়তো একশো বছরে। কিন্তু আমি জানি, আমার পায়ের নিচের খড় যেমন সত্য, তেমনি বিদ্রোহও সত্য। তোমরা সজাগ হও, বন্ধুরা। জীবন যত ক্ষুদ্রই হোক, তোমাদের উত্তরসুরিদের কাছে আমার এই বার্তা পৌছে দিও। যাতে তারাও হাল না ছাড়ে।

'বন্ধুরা, কখনও মনোবল হারিয়ো না। কোন দ্বিধা যেন তোমাদের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। মানুষের মিষ্টি কথায় ভুলো না। মানুষ ও জন্তু একে অপরের উপর নির্ভরশীল—একথা ঠিক নয়। মানুষেরা কখনও অন্যের কথা ভাবে না। যে কোন মূল্যে আমাদের একতা আর বন্ধুত্ব অটুট রাখতে হবে। সব মানুষই আমাদের শত্রু। জন্তুরা সবাই একে অপরের বন্ধু।'

এমন সময় পেছন থেকে সোরগোল শোনা গেল। চারটে ধাড়ি ইঁদুর গর্ত থেকে মাথা বের করে মেজরের বক্তৃতা শুনছিল। কুকুরগুলো দেখতে পেয়ে তাদের তাড়া করেছে। বেচারা ইঁদুরগুলো লম্বা লাফে তাদের গর্তে ফিরে গিয়ে প্রাণে রক্ষা পেল। মেজর ক্ষুর উঁচু করে সবাইকে শান্ত হতে অনুরোধ করল।

'বন্ধুরা,' বলল সে, 'একটা ব্যাপার আমাদের এখনই মীমাংসা করতে হবে। বুনো ইঁদুর, খরগোশ—এরা আমাদের বন্ধু, না শত্রু? ব্যাপারটি ভোটে দেয়া হোক। এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আমি সভায় পেশ করছি—"এরা কি আমাদের বন্ধু?" '

ভোট গ্রহণ করা হলো তৎক্ষণাৎ। বিপুল ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো—'ইঁদুরেরা বন্ধু'। বিপক্ষে পড়ল মাত্র চার ভোট। কুকুর তিনটে আর বিড়াল বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। পরে দেখা গেল, বিড়াল দু'পক্ষেই ভোট দিয়েছে। মেজর বলল, 'আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। আবারও বলছি, মানুষের সব কাজে বাধা দেয়া আমাদের কর্তব্য। দু'পেয়ে যে কোন জীবই আমাদের শত্রু।

'চার পেয়ে, পাখাওয়ালা সবাই আমাদের বন্ধু। যারা মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের আমরা সমর্থন করব। তোমাদের বিদ্রোহ যখন সফল হবে, তখন

মানুষকে ক্ষমা কোরো না। জন্তুরা কখনও ঘরে বাস করবে না, বিছানায় ঘুমাবে না, কাপড় পরবে না, মদ খাবে না, ধূমপান করবে না, টাকা-কড়ি ছোঁবে না বা ব্যবসা করবে না। মানুষের সব অভ্যাসই খারাপ। সবচে' বড় কথা, জন্তুরা স্বজাতির ওপর অত্যাচার করবে না। দুর্বল-শক্তিশালী, বোকা-চালাক সবাই ভাই ভাই। জন্তুরা জন্তুদের হত্যা করবে না- আমরা সবাই সমান।

'বন্ধুরা, এখন আমি স্বপ্নটার কথা তোমাদের বলব। স্বপ্নটা ছিল এমন এক পৃথিবীর, যেখানে কোন মানুষ থাকবে না। স্বপ্নটা আমাকে শৈশবের একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমি যখন শিশু ছিলাম, আমার মা একটা গান গাইত। সব শুয়োরই এই গানের সুর আর প্রথম তিনটে শব্দ জানত। ছোট বেলায় আমি সেই সুর শুনেছি, এর কথাগুলোও জেনেছি, জন্তুরা এখন সেই গান ভুলে গেছে, আমি তোমাদের সেই গানটা শেখাব। আমার গলা ভাল নয়, আমার বিশ্বাস, শিখিয়ে দিলে তোমরা আমার চেয়ে অনেক ভাল গাইতে পারবে। গানটার নাম, "বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড"।' মেজর গলা পরিষ্কার করে গান ধরল।

বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড, বিস্টস অভ আয়ারল্যাণ্ড
বিস্টস অভ এভরি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্লাইম
হেয়রুন (লিসেন) টু মাই জয়ফুল টাইডিংস
অব দ্যা গোল্ডেন ফিউচার টাইম।

সুন অর লেট দ্যা ডে ইজ কামিং
টাইরাণ্ট ম্যান শ্যাল বি ওভারথ্রোন
অ্যাণ্ড দ্যা ফ্রুটফুল ফিল্ডস অভ ইংল্যাণ্ড
শ্যাল বি ট্রড বাই বিস্টস অ্যালোন।

রিংস শ্যাল ভ্রানিস ফ্রম আওয়ার নোজেস
অ্যাণ্ড দ্যা হার্নেস ফ্রম আওয়ার ব্যাক
বিট অ্যাণ্ড স্পার শ্যাল রাস্ট ফর এভার
ক্রুয়েল হুইপস্ নো মোর শ্যাল ক্র্যাক।

রিচেস মোর দ্যান মাইণ্ড ক্যান পিকচার
হুইট অ্যাণ্ড বার্লি ওটস্ অ্যাণ্ড হে
ক্লোভার, বীনস্ অ্যাণ্ড ম্যাংগেল-উরজেলস
শ্যাল বি আওয়ারস আপ অন দ্যাট ডে।

ব্রাইট উইল শাইন দ্যা ফিল্ডস অভ ইংল্যাণ্ড
পিওরার শ্যাল ইটস্ ওয়াটার বি
সুইটার ইয়েট শ্যাল ব্রো ইট্স ব্রীজেস অন দ্যা ডে দ্যাট সেটস আস্ ফ্রি।

ফর দ্যাট ডে উই অল মাস্ট লেবার
দো উই ডাই বিফোর ইট ব্রেক
কাউ'জ অ্যাণ্ড হর্সেস, সী'জ অ্যাণ্ড টার্কিজ
অল মাস্ট টয়েল ফর ফ্রীডম'স সেক।
বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড, বিস্টস অভ আয়ারল্যাণ্ডে
বিস্টস অভ এভরি ল্যান্ড অ্যাণ্ড ক্লাইম
হেরকন ওয়েল অ্যাণ্ড স্প্রেড মাই টাইডিংস
অভ দ্য গোল্ডেন ফিউচার টাইম।

গানের সুর জন্তুদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল। মেজরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা গাইতে শুরু করল, জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা জনও সুরটা আয়ত্ত করে ফেলল। চালাক জন্তু যেমন—কুকুর, শুয়োর এরা পুরো গানটা মুখস্থ করে ফেলল। পুরো খামার 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড'-এর সুরে ফেটে পড়ল। গরুরা গাইল হাম্বা হাম্বা, কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ। ভেড়া গাইল ভ্যাঁ, ভ্যাঁ, ঘোড়া চিঁহি, চিঁহি আর হাঁসেরা ডাকল প্যাঁক প্যাঁক, আনন্দের চোটে বারপাঁচেক গাওয়া হলো গানটা, আরও হয়তো অনেকবার গাওয়া হত, যদি না বাধা পড়ত।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের হট্টগোলে মি. জোনসের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে সিক্সশুটার হাতে নিয়ে তিনি দেখতে বেরুলেন খামারে শেয়াল ঢুকেছে কিনা। জন্তুরা দ্রুত সভা শেষ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। সবাই নিজের শোবার জায়গায় ফিরে গেল। পাখিরা ফিরল নীড়ে, জন্তুরা খড়ের গাদায় মুখ গুঁজল, পুরো খামারে বিরাজ করতে লাগল অটুট নিস্তব্ধতা।

দুই

এই ঘটনার তিনরাত পর বুড়ো মেজর ঘুমের ভেতর মারা গেল। তার মৃতদেহ পুঁতে ফেলা হলো বাগানের ধারে। সময়টা ছিল মার্চের শুরু। এরপর তিনমাস ধরে গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলল খামারে। মেজরের বক্তৃতা বুদ্ধিমান জন্তুদের চোখ

খুলে দিয়েছে। তারা জানে না মেজরের কথিত সেই 'বিদ্রোহ' কবে হবে। কিন্তু বুঝতে পেরেছে, এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে হবে। সবাইকে শেখানোর ও সংগঠিত করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তাল শুয়োরদের ওপর- জন্তুসমাজে তারাই সবচেয়ে চালাক বলে পরিচিত। নেপোলিয়ন ও স্নোবল—দুই শুয়োরের ওপর দেয়া হলো নেতৃত্ব। মি. জোনস এদের পুষেছিলেন বিক্রি করার জন্য।

নেপোলিয়ন বিশালদেহী বার্কশায়ার জাতের শুয়োর। বেশি কথা বলে না, কিন্তু যা বলে তা করে ছাড়ে। স্নোবল নেপোলিয়নের চেয়ে জান্তব চেহারার, কথাবার্তায় চটপটে আর উদ্যোগী, কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তা তার নেই। ফার্মের বাকি শুয়োরগুলো পালা হচ্ছিল মাংসের জন্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিল স্কুয়েলার। ছোট্ট, পেটমোটা এক শুয়োর। গোলগাল থুঁতনি, কুতকুতে চোখ, চঞ্চল ভঙ্গি আর তীক্ষ্ণ গলার স্বর। চমৎকার কথা বলে সে, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গেলে লেজে দোল দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সবাই বলে, সে নাকি সাদাকে কালো করার মত অসম্ভব কাজ করতে পারে।

এরা তিনজন মেজরের ভাবনাকে একটা পরিকল্পনায় রূপ দিল। নাম দিল 'জন্তু মতবাদ'। কয়েক সপ্তাহ পর রাতের বেলা বার্নে এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে অন্যান্যদের কাছে 'জন্তু মতবাদ' প্রচার করতে শুরু করল। প্রথম দিকে তাদের মুখোমুখি হতে হলো জন্তুদের বোকামি আর ঔদাসীন্যের। কিছু জন্তু বলল, মি. জোনসের প্রতি কর্তব্যে ও বিশ্বস্ততায় তারা অটল থাকবে। তারা তাঁকে সম্বোধন করল 'প্রভু' বলে; এবং মন্তব্য করল, 'মি. জোনস আমাদের পালনকর্তা। তিনি যদি না থাকেন তবে সবাই অনাহারে মারা যাব।' অন্যেরা প্রশ্ন তুলল, 'যে ঘটনা আমাদের মৃত্যুর পর ঘটবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? কিংবা, বিদ্রোহ যদি এমনিই আসে তবে তার জন্য কেন মিছেমিছি কষ্ট করা?'

শুয়োরদের বোঝাতে ভীষণ বেগ পেতে হলো যে, এসব কথাবার্তা 'জন্তু মতবাদ' বিরোধী। সবচেয়ে বোকার মত প্রশ্ন করল সুন্দরী মলি। সে স্নোবলকে জিজ্ঞেস করল, বিদ্রোহের পর চিনি পাওয়া যাবে কিনা।

'না,' ভদ্রভাবে জবাব দিল স্নোবল। 'এই খামারে চিনি উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া চিনির কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মাফিক খড় তোমাকে সরবরাহ করা হবে।'

'আমি কি গলায় ফিতে পরতে পারব?'

'বন্ধুরা, যে ফিতে তোমাদের এত প্রিয়, তা হচ্ছে দাসত্বের চিহ্ন। তোমরা কি বুঝতে পারছ না, ফিতের চেয়ে স্বাধীনতা কত দামী?'

মলি মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু স্নোবলের সাথে একমত হতে পেরেছে বলে মনে

হলো না।

সবচেয়ে কষ্ট হলো মোজেসকে বোঝাতে। মোজেস মি. জোনসের আদরের পোষা কাক, গুপ্তচর, মোসাহেব এবং চটুলভাষী। সে বলে, 'চকলেট পাহাড়ের' রহস্য নাকি তার জানা। মৃত্যুর পর জন্তুরা সেখানে চলে যায়। সেই পাহাড়ের অবস্থান আকাশে—মেঘের কাছাকাছি কোথাও। চকলেট পাহাড়ে সপ্তাহে সাতদিনই রোববার, সারা বছরই সুখের। সেখানে ঝোপ-ঝাড়ে জন্মে চিনি আর পিঠা। মোজেস কেবল গল্প করে, কোন কাজ করে না। তাই জন্তুরা তাকে পছন্দ করে না। তবে কেউ কেউ তার চকলেট পাহাড়ের গল্পে বিশ্বাস করে। এরকম জায়গার আসলে কোন অস্তিত্ব নেই, পুরো ব্যাপারটাই বানানো—একথা বোঝাতে শুয়োরদের বেশ বেগ পেতে হলো।

'জন্তু মতবাদ'-এর প্রতি সবচেয়ে বিশ্বস্ত হলো দুই ঘোড়া, বক্সার আর ক্লোভার। এদের নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি নেই। শুয়োরদের গুরু মেনে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনে এবং অন্যদের মাঝে প্রচার করে। সভায় তাদের উপস্থিতি নিয়মিত এবং সভা শেষে 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড'-এর নেতৃত্ব দেয় তারাই।

জন্তুরা যা ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক সহজেই বিদ্রোহ এসে গেল। মি. জোনস খুব কড়া 'প্রভু' হলেও কৃষক হিসেবে মোটেই সফল ছিলেন না। সম্প্রতি তার দিন ভাল যাচ্ছিল না। মামলায় প্রচুর অর্থ খুইয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অতিরিক্ত মদ পানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। সারাদিন রান্নাঘরে চেয়ার পেতে খবরের কাগজ পড়তেন। মদ খেতেন আর মাঝে মাঝে মোজেসকে বিয়ারে ভেজানো রুটি খাওয়াতেন। খামারের শ্রমিকরা ছিল অলস আর অসৎ। জমি ভরে গিয়েছিল আগাছায়, ঘরের ছাউনিতে পচন ধরেছিল, ঝোপগুলো বেড়ে উঠেছিল অযত্নে আর খামারের পশুগুলো প্রায়ই থাকত অনাহারে।

জুন মাস, খড় কাটার সময়। শনিবার বিকেলবেলা মি. জোনস গিয়েছিলেন উইলিংডনে। এত বেশি মদ খেয়েছিলেন যে, রোববার দুপুরের আগে ফিরতে পারলেন না। খামারের শ্রমিকরা সকালবেলা গরুর দুধ দুইয়ে চলে গেল খরগোশ শিকারে, জন্তুগুলোকে খেতে না দিয়েই। মি. জোনস ফিরে এসে ড্রইং রুমের সোফায় বসে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঘুমিয়ে গেলেন। জন্তুগুলো সারাদিন অভুক্ত রইল। খিদেয় অস্থির হয়ে একটা গরু শিংয়ের গুঁতোয় স্টোর রুমের দরজা ভেঙে ফেলল। তার সঙ্গে যোগ দিল বাকিরাও। দরজা ভাঙার শব্দে ঘুম ছুটে গেল মি. জোনসের, পর মুহূর্তে চারজন লোক নিয়ে চাবুক হাতে ছুটে গেলেন সেদিকে।

একে পেটে খিদে, তার ওপর পিঠে চাবুকের আঘাত—জন্তুদের ধৈর্যের বাঁধ

ভেঙে গেল। কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়াই তারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল উৎপীড়কদের ওপর। মি. জোনস ও তার চার শ্রমিকের ওপর লাথি-গুঁতোর বৃষ্টি হতে লাগল। পরিস্থিতি তাদের আয়ত্তে রইল না। জন্তুদের এমন খেপে উঠতে কেউ কখনও দেখেনি। যাদের তারা দাসের মত খাটিয়ে নিয়েছে এতদিন, তাদের বুনো উগ্রতা দেখে ভয় পেয়ে গেল লোকগুলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই দু'জন রণে ভঙ্গ দিল, অল্পক্ষণ পর বাকিরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। খামার ছেড়ে তারা দৌড় দিল সদর রাস্তার দিকে, বিজয় উল্লাসে জন্তুরাও তাদের পেছনে পেছনে ছুটল।

মিসেস জোনস শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সবই দেখলেন। দ্রুত কার্পেট ব্যাগে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে খামার ত্যাগ করলেন তিনি। মোজেস তার পিছু পিছু উড়ে কা কা রবে চিৎকার করতে লাগল। জন্তুরা মি. জোনস ও শ্রমিকদের তাড়িয়ে বের করে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিল। এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই সফল হলো 'জন্তু বিদ্রোহ'। মি. জোনস বিতাড়িত হলেন এবং 'ম্যানর ফার্ম' হলো জন্তুদের।

হঠাৎ পাওয়া এই সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল জন্তুদের। বুঝে ওঠার পর তাদের প্রথম কাজ হলো, লাফাতে লাফাতে খামারের সব জায়গা খুঁজে দেখা যে, আনাচে-কানাচে আরও মানুষ লুকিয়ে আছে কিনা। এরপর ফার্ম হাউসে ফিরে মি. জোনসের সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলা। আস্তাবলের শেষ মাথায় সাজঘর গুঁড়িয়ে দেয়া হলো; কুকুর বাঁধা শেকল, নাকের আংটা, ছুরি—যা ব্যবহার করা হত ভেড়া, ছাগল খোঁজা করার কাজে—সব কুয়োয় ছুঁড়ে ফেলা হলো। চাবুকগুলোকে আগুনে পুড়তে দেখে জন্তুরা আনন্দে নাচ জুড়ে দিল। স্নোবল কেশরে পরার রঙিন ফিতেগুলো আগুনে ছুঁড়ে দিল।

'ফিতে হলো এক ধরনের কাপড়,' সে ঘোষণা করল। 'কাপড় হলো মানুষের চিহ্ন। জন্তুদের নগ্ন থাকা উচিত।'

একথা শুনে বক্সার তার খড়ের টুপিটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। এই টুপি সে ব্যবহার করত গ্রীষ্মের মাছির উপদ্রব থেকে কান রক্ষার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই জন্তুরা মি. জোনসের স্মৃতিবাহী সব জিনিস ধ্বংস করে ফেলল, নেপোলিয়নের নেতৃত্বে তারা হানা দিল স্টোর রুমে। সবাইকে দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হলো আর কুকুরদের জন্য অতিরিক্ত দুটো করে বিস্কুট। সে রাতে ঘুমাবার আগে তারা 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গাইল সাতবার। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, এরকম শান্তির ঘুম তারা আগে কখনও ঘুমায়নি।

আর সব দিনের মতই পরদিন খুব ভোরে তাদের ঘুম ভাঙল। জেগেই মনে

হলো, তাদের হঠাৎ পাওয়া বিজয়ের কথা। চারণভূমিতে যাবার পথে পড়ে ছোট্ট একটা টিলা। সেই টিলার ওপর দাঁড়ালে পুরো খামার এলাকা নজরে আসে। ভোরের প্রথম আলোয় সবাই মিলিত হলো টিলার ওপর। এসবই তাদের—দু'চোখ যদ্দুর যায়, সবই তাদের। এই ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ জুড়ে দিল জন্তুরা। হাওয়ায় ডিগবাজি খেতে লাগল মহা উল্লাসে।

শিশির ভেজা ঘাসে গড়াগড়ি দিল, শেকড়সুদ্ধ ঘাস চিবাতে লাগল। মাটির গন্ধ নিল নাকে। এরপর পুরো খামার ঘুরে ঘুরে দেখল চাষের জমি, বাগান, পুকুর। মনে হলো এর সবই যেন নতুন, তারা আগে কখনও এসব দেখেনি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো সবই এখন তাদের! শুধুই তাদের।

ঘুরে ঘুরে জন্তুরা এল ফার্ম হাউসের কাছে, নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দরজায়। এটাও এখন তাদের, কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে ভেতরে ঢুকতে। নেপোলিয়ন ও স্নোবল কাঁধের ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল। জন্তুরা সারি বেঁধে ঢুকল ভেতরে। খুব সাবধানে, ভয়ে ভয়ে, পা টিপে টিপে, কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল গদিওয়ালা খাট, চমশা, সোফা, দামী কার্পেট, ম্যান্টেল পীসের উপর রাখা রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি দেখে ফিসফিস করে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। সব দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল মলি তাদের সঙ্গে নেই। তাকে খুঁজতে আবার ভেতরে ঢুকল সবাই।

তাকে পাওয়া গেল বেডরুমে। মিসেস জোনসের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গলায় রঙিন ফিতে পরছে সে, নানাভাবে নিজেকে আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। তাকে বকা দিয়ে সবাই বেরিয়ে এল। কিচেনে কিছু হ্যাম ঝুলছিল, সেগুলোকে মাটি চাপা দেয়া হলো। বীয়ারের পিপে বক্সারের লাথিতে গুঁড়িয়ে গেল। আর সব যেমন ছিল, তেমনি রইল। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ফার্ম হাউসে কোন জন্তু বাস করবে না, এটাকে মিউজিয়াম হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে।

এখন পর্যন্ত কারও সকালের খাবার খাওয়া হয়নি। নেপোলিয়ন ও স্নোবল তাদের ডেকে জড়ো হতে বলল। 'বন্ধুরা,' বলল স্নোবল। 'এখন সকাল সাড়ে ছ'টা। আমাদের সামনে বিরাট একটা দিন পড়ে আছে। আজ আমরা শস্য কেটে গোলায় তুলব। কিন্তু তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।'

শুয়োরেরা প্রকাশ করল, গত তিন মাস ধরে তারা গোপনে লিখতে পড়তে শিখেছে। মি. জোনসের বাচ্চাদের ফেলে দেয়া পুরানো বর্ণমালার বই দেখে তারা পড়তে শিখেছে। এরপর তারা সবাই মিলে চলল সদর গেটের দিকে, নেপোলিয়নের হাতে রঙের টিন। স্নোবল (তার হাতের লেখা সবচেয়ে সুন্দর) তার দুই খুরের সাহায্যে শক্ত করে ব্রাশ ধরল। ব্রাশ রঙে ভিজিয়ে গেটের উপর লেখা

'ম্যানর ফার্ম' মুছে লিখল 'জন্তু খামার'। এটাই হলো এই খামারের নতুন নাম। এরপর তারা এল বার্নে। মই ঠেকানো হলো বার্নের দেয়াল ঘেঁষে। শুয়োরেরা ব্যাখ্যা করল, গত ক'মাস গবেষণার পর তারা জন্তু মতবাদ-এর সাতটি নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতিগুলো এখন দেয়ালে লিখে রাখা হবে। 'জন্তু খামারের' সবাইকে এই নীতিগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। স্নোবল বেশ কসরত করে মই বেয়ে উঠল (শুয়োরদের পক্ষে মই বেয়ে ওঠা অত সহজ নয়)। স্কুয়েলার একটু নিচে দাঁড়িয়ে রঙের টিন ধরে থাকল। দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা হলো সাতটি নীতিবাক্য যা প্রায় তিরিশগজ দূর থেকেও পড়া যাবে। নীতিগুলো হলো:

১. দু' পেয়ে সকলেই শত্রু
২. চার পেয়ে ও পাখা বিশিষ্ট সকলেই বন্ধু
৩. কোন জন্তু কাপড় পরবে না
৪. কোন জন্তু বিছানায় ঘুমাবে না
৫. কোন জন্তু মদ খাবে না
৬. জন্তুরা একে অপরকে হত্যা করবে না
৭. সব জন্তু সমান।

লেখাটা হলো ঝকঝকে। কেবল 'বন্ধু' বানানটা একটু ভুল হলো, তাছাড়া আর সবই ঠিক। স্নোবল অন্যান্যদের সুবিধার্থে নীতিগুলো জোরে জোরে পড়ে শোনাল। সবাই নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মতি জ্ঞাপন করল। চালাক জন্তুরা সাথে সাথে নীতিগুলো মুখস্থ করে ফেলল।

'এবার বন্ধুরা,' হাত থেকে রঙ ব্রাশ ফেলে আহ্বান জানাল স্নোবল। 'চলো জমিতে, জোনসের চেয়ে দ্রুত ফসল কেটে আমরা একটা রেকর্ড করে ফেলি।'

গরু তিনটে অনেকক্ষণ থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল, তারা এবার উঁচু স্বরে হাম্বা ডাক ছাড়ল। চব্বিশ ঘণ্টা হলো তাদের দুধ দোয়ানো হয়নি, দুধের বাঁট প্রায় ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর শুয়োরেরা বালতি হাতে চলল দুধ দোয়াতে। খুরের সাহায্যে অনেক কসরতের পর বেশ সাফল্যের সঙ্গেই কাজটা তারা সম্পন্ন করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঁচ বালতি ক্রিম ও ফেনায় উপচানো দুধ জমা হলো। অন্য জন্তুরা কৌতূহলী হয়ে দুধের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই দুধ দিয়ে কি হবে?' কেউ একজন প্রশ্ন করল।

'জোনস আমাদের খাবারের সাথে রোজ কিছু দুধ মিশিয়ে দিত,' বলল মুরগিরা।

'দুধের কথা ভুলে যাও, বন্ধুরা,' দুধের বালতির সামনে দাঁড়িয়ে বলল নেপোলিয়ন। 'এর একটা ব্যবস্থা হবেই। এখন ফসল তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কমরেড স্নোবল এ কাজের নেতৃত্ব দেবে। আমিও একটুপর তোমাদের সাথে যোগ দেব। এখন তোমরা ফসল তুলতে লেগে যাও।'

জন্তুরা দল বেঁধে চলল জমির দিকে, ফসল কাটতে শুরু করল। বিকেলবেলা ফিরে এসে তারা দেখল, বালতির দুধ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তিন

পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় শস্য কেটে জড়ো করতে ঘেমে নেয়ে উঠল জন্তুরা। তবে তাদের পরিশ্রম বৃথা গেল না, ফসলের পরিমাণ হলো আশাতীত। ফসল কাটতে খুব কষ্ট হলো। যন্ত্রপাতিগুলো মানুষের ব্যবহারের জন্য তৈরি, জন্তুদের জন্য নয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পায়ে কাজ করা। কিন্তু শুয়োরেরা শিগ্‌গিরই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় বের করে ফেলল। ঘোড়ারা আগেও খেতের কাজই করত; তাই তারাই এ কাজে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিল। শুয়োরেরা আসলে কোন কাজ করে না, কেবল নির্দেশ দেয় আর দেখাশুনা করে, অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, নেতৃত্ব দেয়া বুদ্ধিমানদেরই কাজ।

শস্য কাটার জন্য বক্সার আর ক্লোভারের হার্নেসের সাথে কাস্তে বেঁধে দেয়া হলো। পেছনে পেছনে একটা শুয়োর চলল 'হ্যাট', 'হ্যাট' করতে করতে। জন্তুরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করল শস্য কেটে ঘরে তুলতে। এমনকি হাঁস-মুরগিরাও চারদিকে ওড়াউড়ি করে মাটিতে পড়ে থাকা শস্য কণা ঠোঁটে করে জড়ো করল। ফসল তোলার কাজ তারা শেষ করল মি. জোনসের শ্রমিকদের চেয়ে দু'দিন আগেই। খামারে এবারের মত ফলন আর কখনও হয়নি। হাঁস-মুরগিদের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে একদানা শস্যও নষ্ট হবার জো ছিল না। তাছাড়া আগের মত চুরি করে খাবার প্রবণতাও কোন জন্তুর মধ্যে দেখা যায়নি।

পুরো গ্রীষ্মকাল জন্তুরা ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করল। প্রতিটি শস্য কণা তাদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে আনল। এ সবই তাদের কষ্টের ফসল, শুধু তাদেরই জন্য। কোন প্রভুর করুণার দান নয়। অকর্মা, রক্তচোষা মানুষগুলো দূর হয়েছে, খাদ্যের আর কোন অভাব নেই। প্রচুর কাজ করেও হাতে অবসর থাকে। তবে ফসল গুদামজাত করতে গিয়ে তাদের নতুন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে

হলো।

শস্যের খড়-কুটো পরিষ্কার করতে হচ্ছিল জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে—কারণ, খামারে কোন মাড়াই করার যন্ত্র নেই। শুয়োরদের বুদ্ধি আর ঘোড়াদের পেশীর জোরে সবকিছু সামলে ওঠা গেল। বক্সার হয়ে দাঁড়াল জন্তুদের অনুপ্রেরণার উৎস। আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে সে। দেখে মনে হয় তিনটে ঘোড়ার শক্তি তার দেহে।

সকাল-সন্ধ্যা একনাগাড়ে কাজ করে, খামারের সব কাজের দায়িত্ব যেন তার একার। একটা মুরগির বাচ্চাকে বলে রেখেছিল, সকাল হবার আধঘণ্টা আগে তাকে জাগিয়ে দিতে। এই অতিরিক্ত সময়টাতে সে দিনের কাজগুলো এগিয়ে রাখত। কাজ শুরুর আগে মনে মনে বলত, আমি আরও বেশি পরিশ্রম করব। এটাকে সে ব্যক্তিগত নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

নিজেদের সাধ্যমত পরিশ্রম করল সবাই। হাঁস-মুরগিরা ঠোঁটে করে প্রায় পাঁচ বুশেল* ঝরা শস্য জড়ো করল মাটি থেকে তুলে। কেউ চুরি করত না, বরাদ্দ রেশনের চেয়ে বেশি কেউ চাইত না। খাবার নিয়ে ঝগড়া, কামড়াকামড়ি, হিংসা আগের দিনগুলোতে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল—এখন আর কেউ ঝগড়া করে না। কেউ কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে না, প্রায় কেউই না।

কেবল মলি অন্যান্যদের মত অত ভোরে ঘুম থেকে জাগতে পারে না, আর কাজ থেকে ফিরেও আসে সবার আগে। জিজ্ঞেস করলে বলে, তার নাকি খুরের ভেতর পাথর ঢুকেছে। আর বেড়ালের আচরণও ছিল বেশ অদ্ভুত। কাজের ডাক পড়লে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজ শেষে খাবার সময় হলেই তাকে আবার দেখা যেত। অনুপস্থিতির কারণগুলো এত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করত যে, তার কাজ করার সদিচ্ছা সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকত না। কেবল বুড়ো গাধা বেনজামিনের কোন পরিবর্তন হলো না।

বিদ্রোহের আগে যেমন ছিল, বিদ্রোহের পরেও তেমনি রইল সে। আগেও যেমন ঢিমেতালে কাজ করত, এখনও তাই করে। স্বেচ্ছায় বা অতিরিক্ত কোন কাজ করে না। বিদ্রোহ বা তার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সে কোন মন্তব্য করত না। যদি কেউ তাকে বলে, 'জোনস ভেগেছে তাই আমরা আগের চেয়ে অনেক সুখে আছি।' সে কেবল বলত, 'গাধারা বহু বছর বাঁচে, তোমরা কখনও কোন গাধার মৃত্যু দেখোনি।' এই রহস্যময় জবাব শুনেই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

রোববার খামারের ছুটির দিন। সকালের খাবার দেয়া হত অন্যান্য দিনের

---

* ১ বুশেল= ৮ গ্যালন

চেয়ে এক ঘণ্টা পর। খাবার পর ছোটখাট একটা অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে পতাকা উত্তোলন। স্নোবল মি. জোনসের ঘরে সবুজ রঙে একটা টেবিল ক্লথ পেয়েছিল, তাতে সাদা রঙের শিং আর খুর আঁকা। এই কাপড়টাই পতাকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্নোবল ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সবুজ রঙ ইংল্যাণ্ডের বিস্তৃত সবুজ খেতের প্রতীক আর সাদা শিং ও খুর হচ্ছে জন্তুদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের প্রতীক। এই রাষ্ট্র যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন পৃথিবীতে মানুষের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। পতাকা উত্তোলনের পর জন্তুরা বার্নে জড়ো হয়, একে বলা হয় 'সভা'। তাতে পুরো সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং কোন সিদ্ধান্ত নেবার থাকলে তা আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত সব সময় শুয়োরেরাই নিত। জন্তুরা শিখেছিল কি করে ভোট দিতে হয়। কিন্তু তারা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। স্নোবল ও নেপোলিয়নের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এরা দু'জন কোন বিষয়েই কখনও একমত হতে পারে না।

সব সময় একে অপরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। সভা শেষে জন্তুরা যখন পেছনের বাগানে বসে বিশ্রাম নিত, দেখা যেত তখনও দু'জনে তর্ক করেই চলেছে। সভা শেষ হত 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' দিয়ে। রোববার পুরো বিকেলটা জন্তুদের ছুটি।

শুয়োরেরা ঘোড়ার সাজঘরের পাশের ঘরটা নিজেদের অফিস বানাল। প্রতিদিন বিকেল বেলা ফার্ম হাউস থেকে আনা বিভিন্ন বই দেখে তারা কাজ শেখে।

স্নোবল ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন্তুদের নিয়ে 'জন্তু সমিতি' গঠনের কাজে। এ কাজে তার কোন ক্লান্তি নেই। মুরগিদের জন্য প্রতিষ্ঠা করল সে 'ডিম উৎপাদক সমিতি'। গরুদের জন্য 'পরিচ্ছন্ন লেজ লীগ', 'বন্য বন্ধুদের জন্য শিক্ষা প্রকল্প' (এই প্রকল্পের কাজ হলো বুনো ইঁদুর ও খরগোশদের পোষ মানানো) ভেড়াদের জন্য 'সাদা উল প্রকল্প' এই রকম আরও বহু কিছু। বলাই বাহুল্য, কোন প্রকল্পই বেশি দিন টিকল না।

'বন্য বন্ধুদের জন্য শিক্ষা প্রকল্প' ভাঙল সবার আগে। বন্য প্রাণীদের আচরণ আগের মতই বৈরি রইল। করুণা বা দয়া দেখানো হলে সে সুযোগে তারা জন্তুদের ক্ষতি করতে ছাড়ত না। বেড়াল এই শিক্ষা প্রকল্পে কিছুদিন উৎসাহ সহকারে কাজ করল। শিগ্‌গিরই দেখা গেল, সে ছাদের ওপর তার নাগালের বাইরে বসে থাকা চড়ুই পাখিদের সঙ্গে গল্প করছে।

সে চড়ুইদের বলছে, এখন সব প্রাণীই একে অপরের বন্ধু, চড়ুইরা ইচ্ছে করলেই তার থাবায় এসে বসতে পারে। কিন্তু চড়ুইরা দূরে দূরেই রইল। কেবল

জন্তুদের লেখা পড়ার ব্যাপারটা কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখল। শরৎকালের মধ্যেই সবাই কিছু কিছু পড়তে শিখল। শুয়োরেরা ইতিমধ্যে চমৎকার পড়তে শিখেছে। কুকুরগুলো ভালই পড়তে শিখেছে, কিন্তু জন্তু মতবাদের সাতটি নীতিমালা ছাড়া অন্য কিছু শেখায় তাদের কোন আগ্রহ নেই। ছাগল মুরিয়েল কুকুরের চেয়ে ভাল পড়তে শিখেছে। ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া পুরানো কাগজগুলো সে পড়তে চেষ্টা করে।

বেনজামিন শুয়োরদের মতই চমৎকার পড়তে শিখেছে, কিন্তু সে ভারি আলসে। তার মতে লেখাপড়ার কোন মূল্য নেই, ক্লোভার বর্ণমালার সব ক'টা মুখস্থ করেছে কিন্তু শব্দ গঠন করতে শেখেনি। বক্সার এ বি সি ডি ছাড়া আর কিছু শিখে উঠতে পারল না, সে ধুলোর ওপর খুর দিয়ে লিখত এ বি সি ডি—তারপর কান নেড়ে এর পরের অক্ষরগুলো ভেবে মনে করার চেষ্টা করত। বেশ কয়েকবারই সে ই এফ জি এইচ শিখেছে। কিন্তু শেখার পর দেখা যেত প্রথম চারটে অক্ষর আর মনে নেই।

তাই সে কেবল প্রথম চারটে অক্ষরই মনে রাখার সিদ্ধান্ত নিল। রোজ ধুলোর ওপর লিখে লিখে সে এই চারটি অক্ষর মনে রাখার চেষ্টা করত। মলি তার নাম বানান করতে যে ক'টা অক্ষর লাগে, তার বেশি কিছু শিখতে চাইল না। সে গাছের পাতায় নিজের নাম লিখে ফুল দিয়ে সাজাত আর মুগ্ধ হয়ে ঘুরে ফিরে দেখত।

খামারের বাকি জন্তুরা 'এ'-র বেশি শিখে উঠতে পারল না। দেখা গেল বোকা জন্তুরা, যেমন হাঁস, মুরগি, ভেড়া এরা এমনকি নীতি সাতটিও মুখস্থ রাখতে পারছে না। অনেক ভাবনার পর স্নোবল ঘোষণা করল, মনে রাখার সুবিধার্থে সাতটি নীতিকে একবাক্যে পরিণত করা হবে। সেটা হলো, 'দু'পাওয়ালারা শত্রু, চার পাওয়ালারা বন্ধু'।

সে জানাল, 'এটাই হচ্ছে "জন্তু মতবাদের" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এটা যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, সে কখনও মানুষের ফাঁদে পা দেবে না।' পাখিরা এই নীতিতে আপত্তি জানাল, তাদেরও তো কেবল দু'পা। কিন্তু স্নোবল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল, 'পাখিদের পাখা চলাচলের অঙ্গ, কাজ করার অঙ্গ নয়। সুতরাং, পাখাকে পা বলে ধরা যেতে পারে। মানুষের বিশিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে হাত, হাত দিয়েই সে যাবতীয় অপকর্ম করে।'

পাখিরা স্নোবলের লম্বা-চওড়া কথা বুঝল না, তবে বিনা বাক্য ব্যয়ে তার ব্যাখ্যা মেনে নিল। 'চারপাওয়ালারা বন্ধু, দুইপাওয়ালারা শত্রু,' এই কথাটি বার্নের দেয়ালের গায়ে সাতটি নীতির ওপরে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়া হলো। মুখস্থ হবার পর এই নীতিবাক্যের ওপর ভেড়াদের গভীর অনুরাগ জন্মে গেল। যখন

তখন ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করে তারা বলে উঠত, 'চারপাওয়ালারা বন্ধু, দুইপাওয়ালারা শত্রু।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা একই কথা আওড়াত, কখনও ক্লান্ত হত না।

স্নোবলের সমিতি আর প্রকল্প নিয়ে নেপোলিয়নের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারমতে বড়দের নিয়ে কোন প্রকল্প করার চেয়ে বাচ্চাদের শিক্ষিত করে তোলাই বেশি জরুরী। ফসল ঘরে তোলার কিছুদিন পর জেসী আর ব্লুবেল, দুই কুকুর নয়টা সবল বাচ্চার জন্ম দিল। যেদিন বাচ্চাগুলো মায়ের দুধ ছাড়ল সেদিনই নেপোলিয়ন তাদের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। বলল, সে তাদের শিক্ষিত করে তুলবে।

বাচ্চাগুলোকে রাখা হলো চিলেকোঠায়, সেখানে কেবল মই দিয়ে ওঠা যায়। বাচ্চাগুলোর কাছে নেপোলিয়ন কাউকে যেতে দিত না, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সবাই বাচ্চাগুলোর কথা ভুলে গেল। গরুর দুধ রোজ গায়েব হবার রহস্য শিগ্‌গিরই বোঝা গেল। দুধ প্রতিদিন শুয়োরের খাবারের সঙ্গে মেশানো হত।

তখন আপেলের মৌসুম। জোর বাতাসে পাকা আপেল ঝরে পড়ছে। জন্তুদের ধারণা ছিল, আপেলগুলো সবার মাঝে সমান ভাগে ভাগ করা হবে। কিন্তু হুকুম হলো, আপেল শুধুমাত্র শুয়োরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কেউ কেউ এই প্রস্তাবে মৃদু আপত্তি তুলল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না।

এই সিদ্ধান্তে সব শুয়োরই একমত, এমনকি স্নোবল আর নেপোলিয়নও। স্কুয়েলারের ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো, ব্যাপারটা জন্তুদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবার। 'বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই শুয়োরদের স্বার্থপর ভাবছ, না?' ব্যাখ্যা করল স্কুয়েলার। 'আসলে আমাদের অনেকেই দুধ ও আপেল অপছন্দ করে, আমি নিজেও আপেল পছন্দ করি না। কিন্তু এসব আমাদের খাওয়া প্রয়োজন।

'আপেল ও দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাই শুয়োরদের জন্য এসব খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, পুরো খামারের ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব আমাদের ওপরই ন্যস্ত। দিনরাত আমরা তোমাদের কল্যাণের কথা ভাবছি। কেবল তোমাদের কথা ভেবেই আমরা আপেল আর দুধ খাই। আমরা যদি আমাদের কর্তব্য ঠিক মত পালন করতে না পারি, তাহলে কি ঘটবে, জানো? জোনস আবার ফিরে আসবে! হ্যাঁ, সে আবার ফিরে আসবে। বন্ধুরা।' আবেগে আপ্লুত হয়ে লেজে দোল দিয়ে বলে চলল স্কুয়েলার, 'তোমরা কি চাও যে, জোনস আবার ফিরে আসুক?'

জন্তুরা কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, একটা কথা খুব ভাল বোঝে যে তারা আর জোনসকে চায় না। স্কুয়েলারের বক্তব্য জন্তুদের চোখ খুলে দিল। তাদের

আর কিছু বলার রইল না। শুয়োরদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার তাৎপর্য এখন তাদের কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সবাই এখন একমত যে, দুধ আর আপেল কেবলমাত্র শুয়োরদেরই প্রাপ্য।

চার

গ্রীষ্মের শেষাশেষি 'জন্তুখামার'-এর ঘটনা পুরো উইলিংডন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। স্নোবল ও নেপোলিয়ন রোজ সকালে কবুতরদের আশপাশের খামারগুলোতে পাঠাত, বিদ্রোহের গল্প শুনিয়ে সেখানকার জন্তুদের উত্তেজিত করতে আর 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' শেখাতে। ওদিকে মি. জোনস সময় কাটাতেন উইলিংডনের 'রেড লায়ন' বারে বসে। উৎসাহী শ্রোতা পেলে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা শোনাতেন, খামারের পাজি জন্তুদের কথা বলতেন। অন্য কৃষকরা তাকে সান্ত্বনা দিত কিন্তু কারও কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলত না।

আসলে সবাই মি. জোনসের দুর্ভাগ্যকে কাজে লাগিয়ে গোপনে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছিল। সৌভাগ্যের কথা হলো, 'জন্তু খামার'-এর পাশের খামার দুটোর অবস্থা তেমন ভাল না, এদের একটার নাম 'ফক্স উড'। বিশাল আকারের, অবহেলিত, পুরানো ধাঁচের খামার ফক্স উড। বন-জঙ্গল আর আগাছা মিলিয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা। মালিক মি. পিলকিংটন ফুলবাবু গোছের লোক। তার অধিকাংশ সময় কাটে মাছ ধরে আর শিকার করে।

অপর খামার 'পিঞ্চ ফিল্ড', আকারে ছোট্ট হলেও অবস্থা 'ফক্স উডের' চেয়ে ভাল। মালিক মি. ফ্রেডরিক ভীষণ ধূর্ত লোক। মামলাবাজ আর দরকষাকষিতে শক্ত বলে তার নাম আছে। দু'জন একে অপরকে এত ঘৃণা করে যে, নিজেদের মধ্যে কোন রকম রফায় পৌঁছানো এদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব, এমনকি তাতে নিজেদের স্বার্থ জড়িত থাকলেও না।

তারা দু'জনেই ভেতরে ভেতরে 'জন্তু খামার'-এর বিদ্রোহ দেখে ভয় পেয়ে গেছেন, নিজেদের খামারের জন্তুদের মধ্যে যাতে এই খবর না ছড়ায় সে ব্যাপারে তাঁরা ভীষণ সতর্ক। প্রথম দিকে, জন্তুরা খামার চালাচ্ছে শুনে তাঁরা হাসতেন। বলতেন, দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই এই বিদ্রোহের অবসান ঘটবে। কে কবে শুনেছে যে জন্তুরা খামার চালাতে পারে?

ভাবতেন, 'ম্যানর ফার্মের' জন্তুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আর অনাহারে মারা যাবে। সময় যায়, কিন্তু কোন জন্তুর অনাহারে মৃত্যুর খবর

আসে না। মি. পিলকিংটন ও মি. ফ্রেডরিক তাদের সুর পাল্টে ফেললেন। বলতে শুরু করলেন, 'ভীষণ অনাচার চলছে "জন্তু খামারে"। জন্তুরা নিজেদের মাংস খাচ্ছে, শাবকগুলোকে মেরে ফেলছে এবং এ হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণের শাস্তি।'

কিন্তু তাদের এই গল্প কেউ পুরোপুরি বিশ্বাস করল না। কোন মানুষের কর্তৃত্ব নেই, জন্তুরাই সর্বময় কর্তা—এরকম একটা সুখী খামারের গল্প কি করে যেন ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের খামারগুলোতে। অন্যান্য খামারের নম্রভদ্র ষাঁড়গুলো হঠাৎ করেই বুনো হয়ে উঠল, ভেড়াগুলো ঝোপ-ঝাড় নষ্ট করে ফেলল। গরুরা দুধের বালতি উল্টে ফেলল, শিকারি কুকুরগুলো শিকার করতে অস্বীকৃতি জানাল। 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ডের' কথা ও সুর প্রচার হয়ে গেল সর্বত্র।

বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল এই গান। মানুষের কানে গেলে তারা রাগে ফেটে পড়ত। তারা একে আবোল-তাবোল শব্দ ছাড়া আর কিছু ভাবত না। 'বুঝতে পারছি না,' তারা বলত, 'জন্তুরা কি করে এমন উদ্ভট সুরে গাইতে পারে?' কোন জন্তুর মুখে এই গান শোনা গেলে তাকে চাবুক মারা হত। কিন্তু এত করেও 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ডের' প্রসার ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

ব্ল্যাকবার্ড ঝোপে বসে শিস দিত, কবুতর বাক্‌বাকুম করত এল্‌ম গাছে। সে গানের সুর এসে মিশত কামারের হাতুড়ির শব্দে আর গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে। মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠত, তাদের চোখে ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কার ছায়া ভাসত।

অক্টোবরের শুরু- খেতের শস্য কেটে উঠানে গাদা করে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু মাড়াইও করা হয়েছে। এমন একদিনে একদল কবুতর বাতাসে ঘুরে ঘুরে খামারের উঠানে নেমে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। তারা দেখল, একদল লোক নিয়ে মি. জোনস সদর রাস্তা ধরে খামারের দিকে এগিয়ে আসছেন। সবার হাতে লাঠিসোটা আর মি. জোনস সর্বাগ্রে বন্দুক হাতে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সন্দেহ নেই তারা আসছে খামারের দখল পুনরুদ্ধার করতে।

এরকম আশঙ্কা জন্তুরা আগেই করেছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নেয়া সারা। 'জুলিয়াস সীজার' কে নিয়ে লেখা একটা বই পড়েছিল স্নোবল। সব রকম আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তেছিল তারই ওপর। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সে সবাইকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব জন্তু নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেল।

মি. জোনসের দলবল ফার্ম হাউসের দিকে এগুতেই স্নোবল আক্রমণের সূচনা করল। কবুতরেরা অনবরত মাথার ওপর উড়ে উড়ে তাদের বিভ্রান্ত করে তুলল। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হাঁস-মুরগির দল হিংস্রভাবে মানুষের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়লো॥ আসলে এটা ছিল কেবল তাদের বিভ্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ করার কৌশল॥ মানুষেরা খুব সহজেই লাঠির আঘাতে হাঁস-মুরগিদের তাড়িয়ে দিতে পারলো॥

দ্বিতীয় দফা আক্রমণ এল তারপর, স্নোবলের নেতৃত্বে মুরিয়েল, বেনজামিন ও ভেড়ার দল মানুষদের ঘিরে ফেলে আঘাত করতে লাগল। বেনজামিন তার শক্ত খুরের সাহায্যে লাথি মারতে লাগল। কিন্তু মানুষের লোহা মারা বুটের আঘাত তারা বেশিক্ষণ সইতে পারল না। এসময় স্নোবলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সবাই একযোগে উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় দিল। এটা ছিল নবোদ্যমে আক্রমণ শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি।

লোকজন আনন্দে চিৎকার করে উঠল। শত্রুদের পিছু হটতে দেখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। স্নোবলও ঠিক তাই আশা করেছিল। জন্তুরা উঠানে জড়ো হলো। ঘোড়া, গরু, শুয়োরেরা গোয়াল ঘরে অবস্থান নিল। বাকি সবাই উঠানে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সময় বুঝে আঘাত হানার ইঙ্গিত দিল স্নোবল॥ সে নিজে আক্রমণ করল স্বয়ং মি. জোনসকে। মি. জোনস স্নোবলকে এগিয়ে আসতে দেখে বন্দুক তুলে গুলি করলেন। গুলিটা স্নোবলের ঘাড় ছুঁয়ে একটা ভেড়ার গায়ে লাগল॥

ভেড়াটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। একটুও ইতস্তত না করে স্নোবল তার বিশাল দেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মি. জোনসের ওপর। মি. জোনস উল্টে পড়লেন শোবরের গাদায়, হাতের বন্দুক কোথায় ছিটকে পড়ল! বক্সার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আক্রমণ করে চলেছে। লোহার নাল লাগানো দু'পা তুলে স্ট্যালিয়ানের মত মহা বিক্রমে আক্রমণ করল সে ফক্সউডের এক শ্রমিককে। লোকটির খুলি ফেটে গেল। কাদায় মুখ থুবড়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেল সে।

এই দৃশ্য দেখে কয়েকজন হাতের লাঠি ফেলে পালাবার চেষ্টা করল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো সবার মাঝে, জন্তুরা একযোগে তাদের ধাওয়া করল। লাথি, গুঁতো আর আঁচড়ের বৃষ্টি হতে লাগল মানুষের ওপর। মহাশত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়ে সব জন্তুই নিজস্ব কায়দায় প্রতিশোধ নিল॥ এমনকি বেড়ালও ছাদের ওপর থেকে একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে দিল।

লোকটি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। সদর গেটের কাছে পৌছাবার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করল সবাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে গেল। শুরুর সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি পালাবার সময়ও মানুষের মাথার ওপর ওড়াউড়ি করে আতঙ্ক বিস্তার করল কবুতরের দল॥ আর পেছন থেকে হাঁসেরা ধাওয়া করে তাদের পালাবার গতি দ্রুততর করল।

কেবল একজন বাদে আর সবাই পালিয়ে গেল। উঠানের কাদায় মুখ থুবড়ে

পড়ে থাকা লোকটিকে বক্সার পা দিয়ে ওল্টানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু লোকটির নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

'মারা গেছে।' বিষণ্ন গলা বক্সারের। 'আমি কাউকে মেরে ফেলতে চাইনি। ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার পায়ে লোহার জুতো। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি ওকে ইচ্ছে করে মারিনি।'

'মানুষের জন্য কোনরকম সহানুভূতি নয়, বন্ধু,' বলল স্নোবল। তার ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। 'যুদ্ধ যুদ্ধই। আর একমাত্র মৃত মানুষই আমাদের জন্য নিরাপদ।'

'কাউকে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না, এমনকি মানুষকেও না,' বক্সার বলল। তার দু'চোখে টলমলে অশ্রু।

'মলি কোথায় গেল?' হঠাৎ খেয়াল হলো সবার। অনেকক্ষণ থেকেই তারা মলিকে দেখছে না।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মলিকে। সবাই ভাবল, হয়তো আহত হয়ে পড়ে আছে কোথাও। কিংবা মানুষেরা যাবার সময় ওকে ধরে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া গেল খড়ের গাদার পেছনে। ভয়ে সেখানে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল। হৈ হট্টগোল শেষ হবার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলল সে, ততক্ষণে অন্যেরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে হাজির। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মলি, ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হবার দশা। অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সে।

বুনো উল্লাসে ফেটে পড়ল জন্তুরা। সবাই যুদ্ধে নিজের কৃতিত্বের কথা ফলাও করে বর্ণনা করতে লাগল। বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হলো তৎক্ষণাৎ। পতাকা উত্তোলন করা হলো। 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গাওয়া হলো। তারপর যুদ্ধে নিহত ভেড়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো। কবরের ওপর কাঁটা ঝোপের গাছ লাগানো হলো। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে স্নোবল যুদ্ধে জীবন দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখল।

যুদ্ধে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, তাদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। বক্সার ও স্নোবলকে 'প্রথম শ্রেণীর জন্তু বীর' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। তাদের সম্মানসূচক 'পেতলের পদক' (ঘোড়ার পুরানো সাজ থেকে খুলে নেয়া) দেয়া হলো রোববার ও অন্যান্য ছুটির দিনে পরার জন্য। 'মরণোত্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তু বীর' উপাধিতে ভূষিত করা হলো নিহত ভেড়াকে।

যুদ্ধের নামকরণ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, এই যুদ্ধের নাম হবে 'গো-শালার যুদ্ধ'। কারণ, মূল আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল গোয়াল ঘর থেকেই। মি. জোনসের বন্দুকটা পাওয়া গেল কাদার ভেতর,

ফার্ম হাউসে পাওয়া গেল বন্দুকের কিছু গুলি। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বন্দুকটিকে পতাকার নিচে খাড়া করে রাখা হবে। বছরে দু'দিন এই বন্দুকের সাহায্যে তোপধ্বনি করা হবে। বারোই অক্টোবর গো-শালার যুদ্ধের স্মরণে আর মধ্য গ্রীষ্মে সফল বিদ্রোহের স্মরণে।

পাঁচ

দেখতে দেখতে শীতকাল এসে গেল। সবকিছু ঠিকমতই চলছে, কেবল মলি একটু ঝামেলা করছে। রোজ কাজে যেতে দেরি করে সে। অজুহাত দেখায় 'ঘুম পেয়েছিল' বলে। শরীরের নানান জায়গায় অদ্ভুত সব অসুখ, যদিও স্বাস্থ্যটা বরাবরই ভাল তার। এরকম নানা অজুহাতে কাজ ফাঁকি দিয়ে চলে যেত সে পুকুরের ধারে। পানিতে মনোযোগ দিয়ে নিজের ছায়া দেখত।

একদিন দেখা গেল উঠানে প্রফুল্ল চিত্তে লেজ নাড়িয়ে খড় চিবুচ্ছে মলি। ক্লোভার ডাকল, 'মলি। তোমাকে কিছু বলার আছে আমার। আজ সকালে দেখলাম তুমি ফক্সউডের সীমানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলে। মি. পিলকিংটনের একজন লোক তখন বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক দূর থেকে দেখছিলাম আমি। মনে হলো···না, আমি নিশ্চিত, লোকটা তোমার সঙ্গে কথা বলছিল। নাকে হাত বুলিয়ে আদর করছিল। এসবের মানে কি?'

'না, এসব সত্যি নয়, আমি ওদিকে যাইনি!' ফুঁপিয়ে উঠল মলি, সামনের দু'পা তুলে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

'মলি, আমার দিকে তাকাও। শপথ করে বলো তো, লোকটা তোমার নাকে হাত বুলিয়ে দেয়নি?'

'না,' প্রতিবাদ করল মলি। কিন্তু ক্লোভারের মুখের দিকে তাকাতে পারল না। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠান ডিঙ্গিয়ে মাঠের দিকে চলল সে।

একটা ভাবনা খেলে গেল ক্লোভারের মনে। কাউকে কিছু না বলে আস্তাবলের দিকে চলল সে। মলির শোবার জায়গার খড় উল্টে দেখল। দেখল, সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একদলা চিনি আর রঙিন ফিতে। এর তিনদিন পর উধাও হয়ে গেল মলি। অনেক দিন তার কোন খবর পাওয়া গেল না। কয়েক সপ্তাহ পর কবুতর খবর নিয়ে এল, মলিকে তারা উইলিংডনে দেখেছে।

ঘোড়াগাড়িতে জুড়ে দেয়া হয়েছে তাকে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল একটা সরাইখানার সামনে। লালমুখো মোটা একজন লোক, দেখে মনে হচ্ছিল

সরাইখানার মালিক; মলিকে আদর করে চিনি খাওয়াচ্ছিল। পিঠে নতুন আচ্ছাদন আর গলায় লাল ফিতে, ভীষণ আনন্দিত দেখাচ্ছিল মলিকে। এর পর কোন জন্তু আর মলির নাম কখনও মুখে আনেনি।

জানুয়ারি মাসে আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মাটি হয়ে উঠল লোহার মত শক্ত, জমিতে কোন ফসল জন্মাল না। বার্নে অনেকবার সভা ডাকা হলো। শুয়োরেরা ব্যস্ত রইল আগামী মৌসুমের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে। তারা খামারের নীতি নির্ধারণ করবে, এটা প্রায় একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। অবশ্য সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হতে হবে। এই নিয়মে হয়তো সব কিছু ভালই চলত, যদি স্নোবল আর নেপোলিয়নের মধ্যে বিবাদ না বাধত।

যেখানে মতানৈক্যের অবকাশ আছে, সেখানে তাদের মতৈক্যের কথা চিন্তাই করা যায় না। যদি একজন বলে এই জমিতে বার্লি লাগানো হবে, তবে অপরজন বলে, গম লাগানো হবে। যদি একজন বলে, এই জমি বাঁধা কপির জন্য উপযুক্ত, তবে অপর জনের অভিমত হচ্ছে এখানে মূলো ছাড়া আর কিছু জন্মাবেই না। দু'জনেই নিজ নিজ মতে অটল থাকত আর ভয়াবহ তর্কযুদ্ধ বেধে যেত।

স্নোবল ভোট পেত তার বাকচাতুর্যে। একই সময়ে নেপোলিয়ন অন্যদের প্রভাবিত করে নিজের পক্ষে টানত। সে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিল ভেড়াদের। ভেড়াগুলো সময়ে অসময়ে চিৎকার করে উঠত, 'চারপাওয়ালারা বন্ধু, দুইপাওয়ালারা শত্রু।' সভা চলাকালীন সময়ে তাদের চিৎকার সভার কাজে বিঘ্ন ঘটাত। লক্ষ করলে দেখা যেত, স্নোবলের বক্তৃতা উত্তুঙ্গে পৌঁছাবার মুহূর্তেই তারা চিৎকার শুরু করত।

স্নোবল 'কৃষক-শ্রমিক' পত্রিকার কিছু পুরানো সংখ্যা খুঁজে পেয়েছিল ফার্ম হাউসে, সেগুলোতে লেখা ছিল নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বানাবার কৌশল। এসব পত্রিকা পড়ে সে বিজ্ঞের মত জমিতে নালা কাটা, জন্তুদের মল থেকে সার তৈরি ও অন্যান্য নতুন নতুন পদ্ধতির কথা বলত। বুদ্ধি দিল, এখন থেকে জন্তুরা জমিতে মল ত্যাগ করবে যাতে মলকে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং পরিবহনের সমস্যা না হয়।

নেপোলিয়নের এরকম কোন পরিকল্পনা নেই। তার মন্তব্য—স্নোবলের বুদ্ধিতে কোন কাজ হবে না। সব কিছুতেই তার ধীর ও নিশ্চিত ভঙ্গি দেখে মনে হত, সে নিজে অন্য কোন পরিকল্পনা করছে। কিন্তু উইণ্ডমিল প্রশ্নে তাদের বিতর্কের তিক্ততা অতীতের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেল।

চাষের জমি থেকে অল্পদূরে টিলার মত একটা জায়গা। অনেক দেখেশুনে স্নোবল ঘোষণা করল, এখানেই উইণ্ডমিল তৈরি হবে। উইণ্ডমিল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতে ডায়নামো চলবে, গোয়ালঘরে বাতি জ্বলবে, শীতকালে উত্তাপ জোগাবে।

করাত, ঘাস কাটা যন্ত্র, দুধ দোয়ানোর যন্ত্রও চলবে।

জন্তুরা এসব কথা আগে কখনও শোনেনি (খামারটা ছিল পুরানো ধাঁচের)। পত্রিকার পাতায় এসব যন্ত্রপাতির ছবি দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে শুনল, যন্ত্রপাতিই এখন থেকে তাদের সব কাজ করে দেবে। তারা কেবল মনের সুখে মাঠে চরবে আর লেখাপড়া করে সময় কাটাতে পারবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্নোবল উইণ্ডমিলের নকশা এঁকে ফেলল। যন্ত্রপাতির বিবরণ পাওয়া গেল, 'গৃহস্থালির কাজের হাজার রকম যন্ত্র,' 'মানুষ সবকিছুর স্থপতি' ও স্প্রারম্ভিক বিদ্যুৎ' বইগুলো থেকে।

স্নোবল ডিম ফোটানোর ঘরটাকে পড়ার ঘর হিসেবে বেছে নিল। ঘরের মেঝেটা ছিল খুব মসৃণ, তার আঁকাআঁকির কাজের জন্য উপযুক্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে সে পড়াশুনা করত। পাথরের ওপর বই খুলে রেখে খুরের সাহায্যে চক দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটত, মাঝে মাঝে উত্তেজনায় নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করত। শেষ পর্যন্ত তার ছবিগুলো হলো খামখেয়ালী আঁকিবুকি, দেখতে কতকটা চাকার মত আজগুবি এক জিনিস।

জন্তুরা তার কিছুই বুঝত না, কেবল মুগ্ধ হয়ে দেখত। সবাই দিনে অন্তত একবার হলেও ছবিটা দেখতে আসত। এমনকি হাঁস-মুরগিরাও আসত। যদিও ছবি না মাড়িয়ে থাকা তাদের পক্ষে বেশ কষ্টকর হত। কেবল নেপোলিয়ন রইল দূরে দূরে। প্রথম থেকেই সে উইণ্ডমিলের বিরোধিতা করে আসছিল।

একদিন হঠাৎ করেই সে গেল উইণ্ডমিলের ছবি দেখতে। গম্ভীরভাবে ঘরের আশেপাশে ঘুরল, মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখে নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করল। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ছবির ওপর পানি ত্যাগ করে দিল সে, তারপর সোজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পুরো খামার উইণ্ডমিল প্রশ্নে দু'ভাগ হয়ে গেল। স্নোবল স্বীকার করল, উইণ্ডমিল তৈরির কাজটা বেশ কঠিন। পাথরের দেয়াল বানাতে হবে, তারপর গড়তে হবে মূল কাঠামো, এর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ডায়নামো ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি (এগুলো কোত্থেকে জোগাড় হবে, সে বলেনি)। সে আশা করছে এক বছরের মধ্যেই কাজটা সম্পন্ন করা যাবে।

ডায়নামো চললে জন্তুদের অনেক কাজ কমে যাবে, তখন কেবল সপ্তাহে তিনদিন কাজ করলেই চলবে। অপর দিকে নেপোলিয়নের মত হলো, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন। উইণ্ডমিল বানানোর পেছনে সময় নষ্ট করলে নির্ঘাত না খেয়ে মরতে হবে। জন্তুরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদলের স্লোগান—'স্নোবলকে ভোট দিলে সপ্তাহে তিনদিন কাজ করতে হবে'। অপর দলের স্লোগান হলো, 'নেপোলিয়নকে ভোট দিলে পেটপুরে খাবার জুটবে।'

একমাত্র বেনজামিন রইল নিরপেক্ষ। সে উইণ্ডমিল বা খাদ্য উৎপাদন কোন প্রচারণাতেই বিশ্বাস করে না। উইণ্ডমিল হোক বা না হোক; সে বলত, 'দিন যে ভাবে চলছে সেভাবেই চলবে।' বলাই বাহুল্য, 'খারাপ ভাবে চলবে।'

উইণ্ডমিল ছাড়াও আরেকটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেটা হলো খামারের নিরাপত্তা। এটা নিশ্চিত, 'গো-শালার যুদ্ধে' পরাজিত হলেও মানুষেরা আবার খামার দখলের চেষ্টা করবে। এই বিশ্বাসের পেছনে কারণও ছিল। মানুষের পরাজয়ের খবর আশপাশের খামারগুলোতে ছড়িয়ে পড়ায় জন্তুরা আরও একগুঁয়ে হয়ে পড়েছে। আগের মতই, নিরাপত্তার প্রশ্নেও স্নোবল-নেপোলিয়ন এক হতে পারল না। নেপোলিয়নের মতে; জন্তুদের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে তার ব্যবহার আয়ত্ত করা উচিত।

স্নোবলের মতে অন্যান্য খামারগুলোতে কবুতরের মাধ্যমে বিদ্রোহের খবর পাঠানো উচিত, যাতে তারাও বিদ্রোহের প্রেরণা পায়। একজন বলল, নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে না পারলে পরাজয় নিশ্চিত। অপরজন বলল, সব জায়গায় যদি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার কোন দরকার নেই। জন্তুরা প্রথমে নেপোলিয়নের কথা শুনল, তারপর শুনল স্নোবলের কথা। মনস্থির করতে পারল না কার কথা ঠিক। আসলে, যে মুহূর্তে যে কথা বলছে তারই পক্ষ নিত তারা।

অবশেষে স্নোবলের নকশা আঁকার কাজ শেষ হলো। পরের রোববার উইণ্ডমিলের কাজ শুরুর প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হবে। জন্তুরা যথারীতি সভায় মিলিত হলো। স্নোবল বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ভেড়ারা ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে গোলমাল শুরু করল। এই চিৎকারের মধ্যেও স্নোবল উইণ্ডমিল তৈরির স্বপক্ষে তার মতামত ব্যক্ত করল। নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়াল পাল্টা বক্তব্য রাখার জন্যে। কঠোর স্বরে বলল, উইণ্ডমিলের পুরো পরিকল্পনাই হলো উদ্ভট। সবাইকে এর বিপক্ষে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করে সে বসে পড়ল।

খুব বেশি হলে আধ মিনিট সময় নিল সে; মনে হলো জন্তুরা তার কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছে। স্নোবল আবার উঠে দাঁড়াল, প্রথমে চিৎকার করতে থাকা ভেড়াগুলোকে থামতে বলল। তারপর আবেগ জড়িত গলায় সবাইকে উইণ্ডমিলের পক্ষে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ জানাল। একটু আগ পর্যন্ত জন্তুদের মন দ্বিধায় দুলছিল। কিন্তু এবার স্নোবলের আবেগ আর বাকমাধুর্য তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সে আবেগ জড়িত গলায় 'জন্তু খামার'-এর ভবিষ্যৎ ছবি এঁকে দেখাল, জন্তুদের ভবিষ্যতে আর এত পরিশ্রম করতে হবে না, তার স্বপ্ন এখন ঘাস-কাটা, কিংবা শালগম তোলার মেশিন ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিদ্যুৎশক্তি, সে

ব্যাখ্যা করছে; মাড়াই কল চালাতে পারে, আলোয় আলোময় করে তুলতে পারে গোটা খামার। কথা শেষ হলে স্পষ্টতই বোঝা গেল, রায় তারই পক্ষে যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল নেপোলিয়ন, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল স্নোবলের দিকে। তারপর উচ্চস্বরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। এরকম শব্দ করতে তাকে আগে আর কেউ দেখেনি।

বাইরে বিকট শব্দ উঠল। পেতলের কলার পরা নয়টা বিশাল ভয়ঙ্কর চেহারার কুকুর ছুটে এল বার্নের দিকে। সরাসরি স্নোবলকে আক্রমণ করে বসল তারা। লাফিয়ে কোনমতে তাদের ধারাল দাঁতেব কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করল স্নোবল। পরমুহূর্তে দরজার দিকে ছুটে গেল সে। কুকুরগুলোও ছুটল তার পিছু পিছু। ভয়ে স্তব্ধ জন্তুরা দরজার কাছে জড়ো হলো পরবর্তী দৃশ্য দেখার জন্য। স্নোবল সব্‌জি খেতের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তার দিকে ছুটছিল।

কুকুরগুলো তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে, এমন সময় স্নোবলের পা পিছলে গেল। মনে হলো এবার আর তার রক্ষা নেই। কিন্তু তক্ষুণি উঠে সে আবার ছুটল আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে। কুকুর তার লেজ কামড়ে ধরল, এক ঝটকায় লেজ ছাড়িয়ে নিল স্নোবল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল সদ্য সৃষ্ট ক্ষত থেকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে খামারের শেষ সীমায় পৌছে গেছে সে ততক্ষণে। ঝোপের ভেতরের এক গর্তে ঢুকে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল সে।

ভীত জন্তুরা নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ল। চিৎকার করতে করতে ফিরে এল ভয়ঙ্কর দর্শন কুকুরগুলো। সবাই অবাক, কেউ বুঝতে পারছে না, এই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলো কোত্থেকে এসেছে। শিগ্‌গিরই জানা গেল, এগুলো হচ্ছে সেই কুকুরের বাচ্চাগুলো; যাদেরকে নেপোলিয়ন মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে নিজের কাছে রেখেছিল। এখনও তারা পূর্ণবয়স্ক হয়নি, কিন্তু দেখতে হয়েছে বিকট ও ভয়াল। সবাই লক্ষ করল, আগে মি. জোনসকে দেখে কুকুরগুলো যেমন লেজ নাড়ত, তেমনি এরাও নেপোলিয়নের পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ছে।

কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে বার্নের উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসল নেপোলিয়ন। এখানে বসেই বুড়ো মেজর একদিন তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নেপোলিয়ন ঘোষণা করল—এখন থেকে রোববারে কোন সভা হবে না। এর কোন প্রয়োজন নেই। এ শুধুই সময়ের অপচয়। খামার পরিচালনার দায়িত্ব নেবে শুয়োর নিয়ে গঠিত এক কমিটি, যার নেতা সে নিজে। এই কমিটির সভা হবে গোপনে, সিদ্ধান্ত সমূহ পরে অন্যান্য জন্তুদের জানিয়ে দেয়া হবে। সভার পরিবর্তে রোববারে পতাকাকে অভিনন্দন জানানো হবে। 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গাওয়া হবে; এবং সারা সপ্তাহের কাজের নির্দেশ গ্রহণ করবে জন্তুরা। কোন বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ থাকবে না।

স্নোবলের বিতাড়ন সবাইকে ভীষণ নাড়া দিয়ে গেছে বলে সভা শিগ্‌গিরই মুলতবী ঘোষণা করা হলো। কয়েকজন তাদের মত প্রকাশের অধিকার ফিরে পাবার জন্য প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল, বক্সারও ছিল সেই দলে। সে কান খাড়া করে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল, চেষ্টা করল ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে বলার। যদিও শেষ পর্যন্ত কিছু বলতে পারল না। গোটা চারেক শুয়োর দাঁড়াল প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু কুকুরগুলো তাদের ঘিরে দাঁড়াতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। এসময় ভেড়াগুলো গগনবিদারী আওয়াজ তুলল, 'চার পেয়েরা বন্ধু, দু'পেয়েরা শত্রু,' চিৎকার চলল প্রায় পনেরো মিনিট ধরে। এবং কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

স্কুয়েলারকে পাঠানো হলো নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। 'বন্ধুরা,' সে বলল। 'আমার বিশ্বাস, সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার কমরেড নেপোলিয়নের এই মহৎ প্রচেষ্টার সবাই প্রশংসা করবে। বন্ধুরা, ভেব না নেতৃত্ব খুব সুখের জিনিস। এই দায়িত্ব খুব কঠিন। কমরেড নেপোলিয়ন মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সব জন্তুই সমান। সবাই যার যার দায়িত্ব পালন করতে পারলেই তিনি সুখী হতেন। কিন্তু, তোমরা যদি কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো, তাহলে কি ঘটবে? যেমন ধরো, তোমরা উইণ্ডমিলের প্রলোভনে ভুলে স্নোবলের কথায় চলার সিদ্ধান্ত নিলে। কিন্তু স্নোবল কে? সবাই জানে, সে দাগী আসামীর চেয়ে ভাল কিছু নয়।'

'কিন্তু "গো-শালার" যুদ্ধে সে বীরের মত লড়েছে,' কেউ একজন বলল।

'বীরত্বটাই কেবল যথেষ্ট নয়,' বলল স্কুয়েলার। 'ন্যায়বোধ, সততা আর আনুগত্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গো-শালার যুদ্ধে স্নোবলের ভূমিকা ছিল বেশ বাড়াবাড়ি। শৃঙ্খলা বন্ধুরা, কঠোর শৃঙ্খলা এটাই হলো আজকের মূলমন্ত্র। একটামাত্র ভুল পদক্ষেপেই শত্রুরা আমাদের গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে যাবে। বন্ধুরা, তোমরা কি আবার জোনসের যুগে ফিরে যেতে চাও?'

সবাই চুপ করে থাকল। আর যাই হোক, জন্তুরা জোনসের যুগে ফিরে যেতে চায় না। রোববার সকালের সভা যদি জোনসকে ফিরিয়ে আনে, তবে সে সভা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। বক্সারের ভাবনা এতক্ষণে শেষ হলো। সে মুখ খুলল, 'কমরেড নেপোলিয়ন যা বলেন, তাই ঠিক।' এরপর থেকে তার ব্যক্তিগত নীতি হলো দুটো—'কমরেড নেপোলিয়ন যা বলেন, তাই ঠিক। আর আমি আরও বেশি পরিশ্রম করব।'

দিনে দিনে আবহাওয়া ভাল হতে শুরু করল, বসন্ত সমাগত প্রায়। স্নোবলের পড়ার ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো এবং মেঝে থেকে তার আঁকা নকশাগুলো ঘষে তুলে ফেলা হলো। জন্তুরা রোববার সকালে বার্নে জড়ো হয়ে সারা সপ্তাহের

কাজের নির্দেশ নিতে শুরু করল। কবর থেকে বুড়ো মেজরের খুলি তুলে এনে পরিষ্কার করে একটা লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে পতাকার পাশে রাখা হয়েছে। পতাকা উত্তোলনের পর জন্তুরা এক সারিতে দাঁড়িয়ে সেই খুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাত।

তারপর জড়ো হত বার্নে। আগের মত যার যেখানে খুশি বসার নিয়ম নেই। নেপোলিয়ন, স্কুয়েলার ও মিনিমাস নামের এক কবি শুয়োর বসে উঁচু প্ল্যাটফর্মে। তাদের ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে সেই নয়টি ভয়াল দর্শন কুকুর। বাকি জন্তুরা বসে বার্নের চার ধারে। নেপোলিয়ন দৃঢ়, কর্কশ কণ্ঠে সারা সপ্তাহের কর্মসূচী পাঠ করে। এরপর একবার 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গেয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্নোবলকে তাড়িয়ে দেবার তিন সপ্তাহ পর একটা কথা শুনে বিস্মিত হলো জন্তুরা। নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছে সে উইণ্ড মিলের কাজ শুরু করবে। মত পরিবর্তনের কোন কারণ সে ব্যাখ্যা করল না। কেবল হুঁশিয়ার করল, এই কাজটা হবে বেশ কষ্টের। এর ফলে তাদের রেশনে ঘাটতি পড়তে পারে। এ বিষয়ে সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুয়োরদের এক কমিটি প্রায় তিন সপ্তাহে একাজ সমাপ্ত করেছে। আশা করা হচ্ছে, এই কাজ বছর দু'য়েকের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সেদিন বিকেলে স্কুয়েলার ব্যাখ্যা করল, কমরেড নেপোলিয়ন আসলে কখনও উইণ্ডমিল তৈরির বিপক্ষে ছিলেন না। তিনিই সর্ব প্রথম এই পরিকল্পনা করেছিলেন। স্নোবল যে সব নকশা এঁকেছিল, সে সব আসলে চুরি করা। সত্যি কথা বলতে কি, উইণ্ডমিল আসলে কমরেড নেপোলিয়নেরই আবিষ্কার।

'তাহলে তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন কেন?' কে যেন জিজ্ঞেস করল।

স্কুয়েলারকে একটু লজ্জিত মনে হলো। তারপর সে বলল, 'এটা ছিল কমরেড নেপোলিয়নের গোপন পরিকল্পনার অংশ। তিনি সব সময় চেষ্টা করেছিলেন কি করে স্নোবলকে তাড়ানো যায়। স্নোবলের উপস্থিতি কেবল এই খামারের সর্বনাশ বয়ে আনত। এখন স্নোবল নেই, সমস্ত পরিকল্পনা এগোবে নিজস্ব গতিতে। এটাই হলো স্কুয়েলারের কৌশল।' সে বেশ কয়েকবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'কৌশল, বন্ধুরা, কৌশল।' আনন্দে লেজ দুলিয়ে লাফিয়ে উঠল সে। কথাটার মানে জন্তুরা বুঝল না। কিন্তু কথাগুলো তাদের অনেকখানি প্রভাবিত করল। সেই সময় কুকুরগুলো হঠাৎ ভয়ঙ্কর গলায় ডেকে উঠল। আর দ্বিধা না করে জন্তুরা স্কুয়েলারের ব্যাখ্যা মেনে নিল।

ছয়

সেই বছরটা জন্তুরা ক্রীতদাসের মত খাটল। এত খাটুনি সত্ত্বেও তারা ছিল সুখী। কোনরকম স্বার্থ ত্যাগে কারও কোন দ্বিধা নেই। কারণ, তারা জানে—এই খাটুনি, স্বার্থত্যাগ কেবল তাদের উত্তরসুরিদের স্বার্থেই, অলস-শোষক মানুষের স্বার্থে নয়। পুরো গ্রীষ্ম আর বসন্তকালে জন্তুরা সপ্তাহে ষাট ঘন্টা কাজ করল। আগস্ট মাসে নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, এখন থেকে রোববার বিকেলেও কাজ করতে হবে। এটা অবশ্য স্বেচ্ছাভিত্তিক, বাধ্যতামূলক নয়।

তবে কাজ না করলে খাবার দেয়া হবে অর্ধেক। এত পরিশ্রম সত্ত্বেও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল।

গত বছরের চেয়ে এবার ফসলও হলো কম। যে দুটো জমিতে গাজর লাগাবার কথা ছিল, তাতে ঠিক করে চাষ দেয়া হয়নি বলে সময় মত গাজর লাগানো হলো না। সহজেই অনুমান করা গেল, আগামী শীতকালটা খুব কষ্টে কাটবে। উইণ্ডমিল তৈরি করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত সব বাধার সম্মুখীন হতে হলো। খামারের এক পাহাড়ের খাদে প্রচুর চুনাপাথর মিলল। বালু আর সিমেন্টও পাওয়া গেল গুদাম ঘরে। সুতরাং, কাঁচামালের কোন সমস্যা রইল না।

কিন্তু সমস্যা হলো, চুনা পাথরগুলোকে টুকরো করা নিয়ে, ক্রো-বার দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভাঙা ছাড়া আর কোন উপায় দেখা গেল না। কিন্তু জন্তুরা ক্রো-বার ব্যবহার করতে জানে না। এক সপ্তাহ ব্যর্থ চেষ্টার পর একজনের মাথায় বুদ্ধি এল, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করার। পাথরের টুকরোগুলো আছে পাহাড়ের খাদে। জন্তুরা বড় বড় টুকরোগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধল। দড়ির অপর মাথা টেনে ধীরে ধীরে পাথরগুলোকে উঁচুতে তোলা হলো।

এরপর দড়ি ঢিলে করলেই পাথরগুলো সোজা নিচের পাথরে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এরপর টুকরোগুলো দিয়ে কাজ করা কোন সমস্যাই নয়। ঘোড়াটানা গাড়িতে করে চূর্ণ পাথরগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এ কাজে গরু, ঘোড়া, ভেড়া এমনকি প্রয়োজনে শুয়োরেরাও হাত লাগাল। গ্রীষ্মের শেষ দিকে অনেক চূর্ণ পাথর জমা হলো। এরপর শুয়োরদের তত্ত্বাবধানে শুরু হলো উইণ্ডমিল তৈরির কাজ।

পাথর ভাঙার কাজটা ছিল শ্রমসাধ্য ও ধীরগতি সম্পন্ন। বড়সড় একটা পাথর পাহাড়ের ওপর টেনে তুলতেই প্রায় সারাদিন লেগে যেত। আবার অনেক সময়

সেগুলো নিচে পড়ে ভাঙতও না। বক্সারের সাহায্য ছাড়া এসব কাজ সম্ভবই হত না, সে একাই সবার চেয়ে বেশি কাজ করত। যখন ভারী পাথরগুলো টেনে তোলা অসম্ভব মনে হত, জন্তুরা হতাশায় চিৎকার করত; তখন বক্সার সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি টেনে পাথরগুলো পাহাড়ের চূড়ায় তুলত। একটু একটু করে পাথরগুলো তুলত সে। শ্বাস-প্রশ্বাস হত দ্রুততর। খুরগুলো মাটিতে ডেবে যেত। সারা শরীর চুপচুপে হয়ে যেত ঘামে।

সবাই তাকে দেখে উৎসাহ পেত। ক্লোভার তাকে প্রায়ই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে নিষেধ করত। কিন্তু বক্সার শুনত না। 'আমি আরও পরিশ্রম করব,' আর 'কমরেড নেপোলিয়ন সর্বদাই সঠিক'—এই দুটো কথা সব সময় বলত সে। সে মুরগির বাচ্চাদের বলেছিল, তাকে যেন আধঘণ্টার বদলে রোজ পৌনে একঘণ্টা আগে ডেকে দেয়া হয়। এই অতিরিক্ত সময়টাতে সে একাই চলে যেত পাহাড়ের খাদে। টুকরো পাথরগুলো এনে জড়ো করত উইণ্ডমিলের কাছে।

বেশি পরিশ্রম করতে জন্তুদের খারাপ লাগত না। খাদ্যের পরিমাণ জোনসের সময়ের চেয়ে বেশি না হলেও কম ছিল না। নিজেরা খাদ্য উৎপাদনের সুবিধা হলো, জোনস ও তার লোকদের জন্য কোন খাবার রাখতে হচ্ছে না। ফলে খাবারের পরিমাণ ঠিক করা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সব কাজেই জন্তুদের দক্ষতা বেড়েছে, তাই পরিশ্রম আগের চেয়ে কমেছে। জন্তুরা আর শস্য চুরি করে না, খেতের চারধারে বেড়াও দিতে হয় না।

ফলে কাজ অনেক কমে গেছে। অবশ্য নতুন নতুন কিছু সমস্যার উদ্ভবও হয়েছে। বছর শেষে অনেক জিনিসের ঘাটতি দেখা দিল। জ্বালানী তেল, বিস্কুট, পেরেক, দড়ি, ঘোড়ার নালের জন্য লোহা—এসবের কোনটাই খামারে তৈরি হয় না। আরও দরকার বীজ, সার এবং উইণ্ডমিলের জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতি। কেউ বুঝতে পারল না, এসব কি করে জোগাড় হবে।

এক রোববার সকালে জন্তুরা বার্নে সমবেত হলো তাদের সাপ্তাহিক কাজের নির্দেশ নেয়ার জন্য। নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আশেপাশের খামারগুলোর সঙ্গে ব্যবসা করবে। অবশ্যই কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা মেটাবার জন্য। উইণ্ডমিলের যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এজন্য সে মজুদকৃত খড় ও গমের কিছু অংশ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যদি প্রয়োজন হয়, তবে মুরগির ডিম বিক্রি করে অতিরিক্ত টাকার চাহিদা মেটানো যেতে পারে। নেপোলিয়ন আশা প্রকাশ করল, উইণ্ডমিলের মত মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুরগিরা এই ত্যাগকে স্বাগত জানাবে। এই ঘোষণায় জন্তুরা অস্বস্তি বোধ করল। জোনসের পতনের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল—

মানুষের সঙ্গে কোন লেনদেন নয়। তাদের সঙ্গে কোন ব্যবসা নয়। টাকার ব্যবহার নয়। সবারই কথাটা মনে আছে।

সবাই চুপ থাকলেও, সেই চার শুয়োর মৃদু প্রতিবাদ করল, কিন্তু কুকুরদের ভয়ঙ্কর গর্জনে তাদের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল। ভেড়াগুলো ভ্যা ভ্যা করে উঠল, 'চার পেয়েরা বন্ধু, দু'পেয়েরা শত্রু।' সভার থমথমে ভাব কেটে গেল। নেপোলিয়ন তার খুরে শব্দ তুলে ভেড়াদের থামতে বলল। জানাল, এ ব্যাপারে সমস্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে।

মানুষের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন নেই জন্তুদের। সে একাই সব দায়িত্ব নেবে। একজন আইনজীবী দুই খামারের মধ্যেকার ব্যবসার মধ্যস্থতা করবেন। তিনি প্রতি সোমবার সকালে এসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে যাবেন। 'জন্তু খামার দীর্ঘজীবী হোক,' বলে নেপোলিয়ন তার বক্তব্য শেষ করল। এর পর 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গেয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

এরপর স্কুয়েলার চলল জন্তুদের বোঝাতে। মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না, এমন কোন সিদ্ধান্ত কখনও নেয়া হয়নি। সে জন্তুদের নিশ্চিত করল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। সম্ভবত দুষ্ট স্নোবলই একথা রটিয়েছে। কিছু সংখ্যক জন্তু এর পরেও সন্দেহ প্রকাশ করল। তখন ধূর্ত স্কুয়েলার প্রশ্ন করল, 'তোমরা কি নিশ্চিত যে, এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল? এর কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে? এমন কথা কি কোথাও লিখে রাখা হয়েছে?' কথা সত্য, এ কথা কোথাও লেখা নেই। জন্তুরা ভাবল, আসলে হয়তো তারাই ভুল বুঝেছে।

চুক্তি হলো, প্রতি সোমবার সকালে আইনজীবী মি. হুয়িম্পার আসবেন। ধূর্ত চেহারার, জুলফিওয়ালা, আইনজীবী তিনি। কিন্তু এটুকু বোঝেন এই খামারের ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারীর যথেষ্ট আয়ের সম্ভাবনা আছে। তার আসা-যাওয়া জন্তুরা ভীত চোখে দেখতে লাগল। যদ্দূর সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলল সবাই। নেপোলিয়ন একাই মি. হুয়িম্পারের সঙ্গে কাজ কারবার চালাতে লাগল, এ প্রসঙ্গে সে কারও সাথে কথা বলত না।

মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রইল আগের মতই। মানুষরা এখন 'জন্তু খামার'কে কেবল অপছন্দই করে না বরং রীতিমত ঘৃণা করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিগ্‌গিরই জন্তু খামার দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং উইণ্ডমিল প্রকল্প কেঁচে যাবে। সরাইখানার আড্ডায় একে অপরকে বোঝাত যে, উইণ্ডমিলটা অবশ্য ভেঙে পড়বে। আর যদি দাঁড়িয়েও থাকে তবে অবশ্যই কোন কাজ করবে না।

কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা জন্তুদের সমীহ করতে শুরু করল। যত যাই হোক, একদল জন্তু 'ম্যানর ফার্ম' চালাচ্ছে। তারা নিজের অজান্তেই 'ম্যানর ফার্ম'

কে 'জন্তু খামার' বলে ডাকতে শুরু করল। মি. জোনসের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করল সবাই। মি. জোনসও খামার ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। একমাত্র মি. হুয়িম্পার ছাড়া বাইরের জগতের আর কারও সঙ্গে জন্তুজগতের কোন সম্পর্ক রইল না। এরই মাঝে একদিন গুজব শোনা গেল, নেপোলিয়ন শিগ্‌গিরই ফক্সউডের মি. পিলকিংটন কিংবা পিঞ্চফিল্ডের মি. ফ্রেডরিকের সঙ্গে ব্যবসায় নামতে যাচ্ছে।

এসময় শুয়োরেরা আস্তাবল ছেড়ে ফার্ম হাউসে থাকতে শুরু করল। জন্তুদের মনে পড়ল, ফার্ম হাউসে বসবাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে। কিন্তু স্কুয়েলার বোঝাল—জন্তুরা যা ভাবছে, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। ফার্ম হাউসে থাকা শুয়োরদের জন্য খুবই দরকারী। তারাই এই খামারটা পরিচালনা করে। তাদের জন্য দরকার একটা নিরিবিলি পরিবেশ।

আর একজন নেতার (নেপোলিয়নকে তারা ইতিমধ্যে নেতার মর্যাদা দান করেছে) পক্ষে খোঁয়াড়ে থাকাটা ঠিক মানানসই নয়। জন্তুরা আরও বিরক্ত হলো; যখন জানা গেল যে, শুয়োরেরা রান্না ঘরে খাচ্ছে, ড্রইংরুমকে ব্যবহার করছে অবসর কাটানোর জন্য আর ঘুমাচ্ছে বিছানায়। বক্সার সেই আগের মত- 'কমরেড নেপোলিয়ন সর্বদাই ঠিক' এই আপ্তবাক্য আউড়ে চুপ করে থাকল।

কিন্তু ক্লোভার বিছানা ব্যবহারের ওপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কথা মনে করতে পারল। বার্নের দেয়ালে লেখা নীতিগুলো পড়তে গেল সে। কিন্তু পড়তে না পেরে ডাকল মুরিয়েলকে। 'মুরিয়েল,' সে বলল। 'আমাকে চার নম্বর নিয়মটা একটু পড়ে শোনাবে? এতে বোধহয় জন্তুদের জন্য বিছানা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।'

মুরিয়েল কষ্ট করে লেখাটা পড়ল। 'এতে বলা হয়েছে—"কোন জন্তু বিছানায় চাদর বিছিয়ে ঘুমাতে পারবে না"।'

চার নম্বর নিয়মে কোন 'চাদরের' কথা ছিল কি না, মনে করতে পারল না ক্লোভার। কিন্তু লেখা যখন আছে, তখন ভুলটা তারই। এ সময় কয়েকটা কুকুর সহকারে স্কুয়েলার যাচ্ছিল সে পথ দিয়ে। সে পুরো ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দিল।

'তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ,' সে বলল, 'শুয়োরেরা এখন বিছানায় ঘুমাচ্ছে? কিন্তু কেন ঘুমাবে না? বিছানার ব্যাপারে তো কখনও কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বিছানা হলো ঘুমাবার জায়গা। খড়ের গাদাও তো এক রকম বিছানা। নিষেধাজ্ঞা ছিল চাদরের ওপর। চাদর হলো মানুষের আবিষ্কার। বিছানা থেকে আমরা চাদর সরিয়ে ফেলেছি। আমরা ঘুমাই কম্বল বিছিয়ে। তাতেও বেশ আরাম হয় এবং এটুকু আরাম আমাদের প্রাপ্য। কারণ, আমরা মগজ খাটিয়ে সব কাজ করি।

বিনিময়ে তোমরা নিশ্চয় এই অধিকারটুকু কেড়ে নেবে না? তোমরা কি চাও, জোনস আবার ফিরে আসুক?'

জন্তুরা স্কুয়েলারের কথা সমর্থন করল। শুয়োরদের বিছানায় ঘুমানো নিয়ে আপত্তি তুলল না কেউ। আরও ক'দিন পর ঘোষণা করা হলো, শুয়োরেরা অন্য জন্তুদের চেয়ে এক ঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠবে। এ নিয়েও কোন আপত্তি উঠল না।

শরৎকাল এল। জন্তুরা অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত কিন্তু সুখী। গত বছরটা তাদের বেশ কষ্টে কেটেছে। খড় আর শস্য বিক্রির পর শীতকালের জন্য আর বেশি খাবার রইল না। কিন্তু তাদের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে রাখল উইণ্ডমিল। উইণ্ডমিলের কাজ প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে। শস্য কাটার পর আবহাওয়া হয়ে উঠল ঝকঝকে, সুন্দর। জন্তুরা আগের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করল।

উইণ্ডমিলের ফুটখানেক দেয়াল তোলা হয়েছে। বক্সার রাতের বেলা চাঁদের আলোয় কাজ করতে শুরু করল। অবসর সময়ে জন্তুরা উইণ্ডমিলের চারধারে ঘুরে ঘুরে দেখত। নিজেদের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গর্ববোধ করত। বলত, এত সুন্দর জিনিস তারা আর কখনও বানাতে পারবে না। শুধু বুড়ো বেনজামিন নিস্পৃহ। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করে বলে, 'গাধারা অনেক দিন বাঁচে।'

নভেম্বর এল এলোমেলো দুরন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমা বাতাস নিয়ে। উইণ্ডমিলের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হলো। বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে সিমেন্ট মেশানো যাচ্ছে না। এক রাতে এল ঝড়। ভয়ঙ্কর সেই ঝড়ে ফার্ম হাউসের ভিত্ কেঁপে উঠল, বার্নের ছাদ ধসে গেল। মুরগিরা ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। কারণ, তারা নাকি গুলির শব্দ শুনেছে।

সকাল বেলা ঝড় থামল, জন্তুরা বাইরে বের হলো। পুরো খামারের অবস্থা লণ্ডভণ্ড। পতাকা ধুলায় লুটাচ্ছে, বাতাস এল্ম গাছটাকে মূলোর মত উপড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য, উইণ্ডমিল ধ্বংস হয়ে গেছে! অকুস্থলে জড়ো হলো সবাই, নেপোলিয়নও আছে তাদের মধ্যে। তাদের এত পরিশ্রমের ফসল মাটিতে মিশে গেছে, হতাশায় কারও গলায় কথা ফুটল না।

কেবল বিষণ্ন গলায় ফোঁপাতে লাগল সবাই। নেপোলিয়ন অস্থির পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে। দ্রুত এদিক-সেদিক লেজ নাড়ছে, চিন্তা করছে নেপোলিয়ন—এটা তারই লক্ষণ। হঠাৎ থেমে গেল সে, যেন বুঝে ফেলেছে পুরো ব্যাপারটা। 'বন্ধুরা, তোমরা জানো এজন্য দায়ী কে? জানো, কোন শত্রু এসে রাতের আঁধারে উইণ্ডমিল গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে? স্নোবল!' সে গলার স্বর আরও এক ধাপ চড়াল। 'স্নোবল করেছে এই কাজ। শুধুমাত্র হিংসার বশে আমাদের এক বছরের পরিশ্রমের ফসল একরাতে ধ্বংস

করেছে সে। বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে স্নোবলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি। যে তাকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে, তাকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর বীর" উপাধিতে ভূষিত করা হবে। আর পুরস্কার দেয়া হবে এক বুশেল আপেল।'

জন্তুরা শুনে আহত হলো, স্নোবল এত খারাপ কাজ করতে পারে? ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করল সবাই। ভাবতে শুরু করল, কি করে তাকে জীবিত অবস্থায় ধরা যায়! একটু পরেই টিলার আশেপাশে শুয়োরের পায়ের দাগ আবিষ্কৃত হলো। মাত্র কয়েক গজ অনুসরণ করা গেল সেই পদচিহ্ন। অনুমানে বোঝা গেল, পদচিহ্ন মিলিয়ে গেছে ঝোপের ভেতরের এক গর্তের দিকে। নেপোলিয়ন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'এগুলো স্নোবলের পায়ের ছাপ।' তার ধারণা, স্নোবল ফক্সউড থেকে এসেছিল হামলা চালাতে।

'আর দেরি নয় বন্ধুরা,' নেপোলিয়ন পদচিহ্নগুলো পরীক্ষা শেষ করে বলল। 'অনেক কাজ পড়ে আছে। কাল সকালেই আমরা আবার নতুন করে উইণ্ডমিল তৈরির কাজ শুরু করব। পুরো শীতকালটা আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। রোদ, বৃষ্টি যাই হোক না কেন। পাজী, হতচ্ছাড়াটাকে দেখিয়ে দেব অত সহজে আমরা হাল ছাড়ছি না। এই কথার কোন হেরফের হবে না। এগিয়ে চলো, বন্ধুরা! উইণ্ডমিল দীর্ঘজীবী হোক! জন্তু খামার দীর্ঘজীবী হোক।'

সাত

শীতকালটা দুর্যোগ বয়ে নিয়ে এল। তুষার ঝড় আর শিলাবৃষ্টি চলল ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত। নতুন করে উইণ্ডমিলের কাজ শুরু করল জন্তুরা। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করছে সবাই। তারা জানে, বাইরের পৃথিবীর হিংসুটে মানুষগুলো তাদের কার্যকলাপ উদগ্রীব হয়ে দেখছে। ব্যর্থ হলে তাদের কাছে মুখ দেখানোর জো থাকবে না।

মানুষের বিশ্বাস, স্নোবল উইণ্ডমিল ধ্বংস করেনি। উইণ্ডমিল ধসেছে ঝড়ে। কারণ, দেয়ালটার গাঁথুনি যথেষ্ট মজবুত ছিল না। জন্তুরা বিশ্বাস করল না সে কথা। তবুও এবার দেয়ালটা আগের আঠারো ইঞ্চির বদলে তিনফুট পুরু করে গাঁথা হলো। তার মানে, আগের চেয়ে দ্বিগুণ পাথরের প্রয়োজন। তুষারে চুনাপাথরের খনি ঢেকে গেল, ফলে কাজ এগোল না। জন্তুরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। ঠাণ্ডা ও খিদেয় তারা ক্লান্ত, শুধু বক্সার ও ক্লোভারের কোন ক্লান্তি নেই।

স্কুয়েলার জন্তুদের উৎসাহ দেবার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমের মর্যাদার ওপর লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিত। কিন্তু জন্তুরা তার বক্তৃতার চেয়ে বরং বক্সার-ক্লোভারকে দেখেই বেশি উৎসাহ পেত। জানুয়ারি মাসে খাদ্যাভাব দেখা দিল। দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হলো। ঘোষণা করা হলো, এরপর থেকে রেশনে শস্যের বদলে আলু দেয়া হবে। কিন্তু আলুগুলো ভালমত ঢেকে রাখার পরও পচে গেছে, খুব অল্প সংখ্যকই আছে খাওয়ার যোগ্য। ক'দিন পর কেবল খড় ও খৈল ছাড়া আর কিছুই রইল না। সবাই বুঝল, সামনের দিনগুলো কাটাতে হবে অনাহারে।

খাদ্যাভাবের ব্যাপারটা মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা জরুরী হয়ে পড়ল। এমনিতেই উইণ্ডমিলের ব্যাপারটা নিয়ে নানা রকম কেচ্ছা ছড়িয়েছে। গুজব রটেছে, জন্তুরা দুর্ভিক্ষ আর রোগে মারা যাচ্ছে, নিজেরা মারামারি করছে, স্বজাতির মাংস খাচ্ছে এবং শিশু হত্যার মত জঘন্য কাজ করছে। নেপোলিয়ন বোঝে, আসল অবস্থার কথা জানাজানি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। সে বুদ্ধি আঁটল, মি. হুয়িম্পারের মাধ্যমে মানুষের ধারণা বদলে দেয়া হবে।

খামারের অন্য জন্তুদের সাথে ভদ্রলোকের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন একদল ভেড়া আইনজীবীর সাথে দেখা করে জানাল, খামারে কোন খাদ্যাভাব নেই। নেপোলিয়নের নির্দেশে আগেই খালি ব্যারেলগুলো বালি দিয়ে ভর্তি করে তার ওপর খানিকটা শস্য ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। মি. হুয়িম্পার গুদাম পরিদর্শন করে শস্যের ভরা ব্যারেল দেখে বাইরের পৃথিবীকে জানালেন—জন্তু খামারে খাদ্যের কোন অভাব নেই।

জানুয়ারির শেষ দিকে খাদ্যাভাব তীব্র হয়ে উঠল। শিগ্‌গিরই খাদ্য জোগাড় না হলে জন্তুদের অনাহারে থাকতে হবে, আজকাল আর নেপোলিয়ন জন্তু সমক্ষে আসে না। সময় কাটায় ফার্ম হাউসে। কুকুরগুলো ফার্ম হাউসের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। মাঝে মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যখন বাইরে আসে, তখন তাকে ঘিরে থাকে কুকুরগুলো। এখন আর রোববারের সভায়ও তাকে দেখা যায় না। সবাই কাজের নির্দেশ নেয় স্কুয়েলারের কাছ থেকে।

এক রোববারে স্কুয়েলার ঘোষণা করল, এখন থেকে মুরগির ডিম বিক্রি করা হবে, নেপোলিয়ন সপ্তাহে চারশো ডিম সরবরাহের চুক্তি করেছে। এই ডিম বিক্রির অর্থে খাদ্য কেনা হবে। ঘোষণা শুনে মুরগিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। একথা তাদের আগেও জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ ভাবেনি, সত্যিই এর প্রয়োজন হবে। মুরগিরা এসময় আসন্ন বসন্ত কালের জন্যে বাচ্চা ফোটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এসময় ডিম বিক্রি মুরগি হত্যার সামিল। তারা এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করল। তিনটে কালো মুরগির নেতৃত্বে সংগঠিত হলো তারা।

জোনসের বিতাড়ণের পর এই প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল জন্তু খামারে। মুরগিরা ছাদের ওপর উড়ে উড়ে ডিম পাড়তে শুরু করল। ছাদে পড়ার সাথে সাথে ভেঙে যেত ডিমগুলো। বিদ্রোহী মুরগিদের শায়েস্তা করার জন্য ঘোষণা করল নেপোলিয়ন, এখন থেকে মুরগিদের খাবার বন্ধ। কেউ যদি তাদের খেতে দেয়, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। এই আদেশ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা, কুকুরেরা সেদিকে লক্ষ রাখল। পাঁচদিন অনাহারে থাকার পর মুরগিরা নতি স্বীকার করল।

এরই মধ্যে মারা গেল নয়টি মুরগি। মৃতদেহগুলো পুঁতে ফেলা হলো বাগানের ধারে। সবাই জানল, রোগে ভুগে মারা গেছে মুরগিগুলো। মি. হুয়িম্পার এসবের কিছুই জানলেন না। কেবল চুক্তি অনুযায়ী সপ্তাহে চারশো ডিমের চালান গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে স্নোবলের আর কোন খবর মেলেনি। শোনা যায়, সে আশপাশের কোন খামারেই আত্মগোপন করে আছে। জন্তু খামারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খামারের প্রায় দশ বছরের পুরানো বীচ্ গাছের গুঁড়িটা বিক্রি করে দেবে। ফ্রেডরিক ও পিলকিংটন, দু'জনেই কেনার আগ্রহ দেখালেন, ফ্রেডরিকের সাথে রফায় পৌছালে শোনা যায়, স্নোবল আত্মগোপন করেছে ফক্সউডে। আর পিলকিংটনের সাথে আলাপ করলে জানা যায়, স্নোবল আশ্রয় নিয়েছে পিঞ্চফিল্ড ফার্মে।

বসন্তের শুরুতে একটা আতঙ্কের খবর ছড়িয়ে পড়ল, স্নোবল রোজ রাতে জন্তু খামারে হানা দেয়! জন্তুদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। স্নোবল খাবার চুরি করে, গরুর দুধ দুইয়ে নিয়ে যায়, ডিম ভেঙে রাখে, বীজতলা—এমনকি গাছের ফলও নষ্ট করে। কোথাও কোন গোলমাল হলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া হয় এটা স্নোবলের কাজ। যদি জানলার কাঁচ ভাঙে বা নালাগুলো বুজে যায়, তবে বোঝা যায় স্নোবল এসেছিল রাতের বেলা। একদিন গুদাম ঘরের চাবি হারিয়ে গেল। সবাই ধরে নিল, স্নোবল নির্ঘাত কুয়োয় ফেলে দিয়েছে চাবিটা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তা পাওয়া গেল বস্তার নিচে। কিন্তু তাতে কারও বিশ্বাস টলল না। শীতকালে বুনো ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেল। সবাই বলল, স্নোবলের সাথে ইঁদুরের গোপন যোগাযোগ আছে। এরকম উৎপাত কিছুদিন চলার পর তদন্তের নির্দেশ দিল নেপোলিয়ন। কুকুরের শোভাযাত্রা সহকারে খামার পরিদর্শনে বের হলো সে, অন্যেরা একটু দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করল। মাটি শুঁকে শুঁকে স্নোবলের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করল সবাই। সর্বত্রই খোঁজা হলো—বার্ন, গোয়াল, মুরগির খোঁয়াড়, সবজি খেত কিছুই বাদ গেল না। সব জায়গাতেই স্নোবলের উপস্থিতির নিদর্শন মিলল।

খানিকক্ষণ পরপরই নেপোলিয়ন চিৎকার করে জানান দিচ্ছিল, 'স্নোবল এখানে এসেছিল, আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।' প্রতিবার স্নোবলের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে কুকুরগুলো রক্ত হিম করা গলায় ডেকে উঠল। জন্তুরা ভয়ে অস্থির। মনে হচ্ছিল, স্নোবল বোধহয় বাতাসের সঙ্গে মিশে তাদের ঘিরে আছে। বিকেলে বার্নে সভা ডাকা হলো। স্কুয়েলারের থমথমে মুখ দেখে সবাই বুঝল, কোন খারাপ খবর আছে।

'বন্ধুরা,' অস্থির ভঙ্গিতে লেজ নাড়ল স্কুয়েলার। 'একটা ভয়ঙ্কর কথা শোনা গেছে। স্নোবল মানুষের সাথে যোগ দিয়ে খামারটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার চক্রান্ত করছে। সে এখন ফ্রেডরিকের আশ্রয়ে আছে। আমরা জানতাম, সে বিদ্রোহ করেছিল নিজের উচ্চাশা পূরণের জন্য। আসলে তা নয়, সে শুরু থেকেই জোনসের হয়ে কাজ করত। কিছু সদ্য আবিষ্কৃত গোপন দলিল থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। আর গোশালার যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবার ব্যাপারে তার ব্যর্থ চেষ্টার কথা তো সবার জানা।'

জন্তুরা একেবারেই বোকা বনে গেল। কথাগুলো তারা বিশ্বাস করতে পারল না। সবারই মনে আছে, গো-শালার যুদ্ধে স্নোবল বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে। জোনসের গুলিতে সে আহতও হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও পিছু হটেনি। কারও মাথায় এল না, কি করে স্নোবল জোনসের পক্ষ নিয়েছিল! স্বল্পভাষী বক্সারও বোকা হয়ে গেল। পা মুড়ে, চোখ বুজে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আমি এসব বিশ্বাস করি না। স্নোবল যুদ্ধে বীরের মত লড়েছে। আমরা তাকে "প্রথম শ্রেণীর জন্তুবীর" উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম, তাই না?'

'পুরো ব্যাপারটা আমরা ভুল বুঝেছিলাম। গোপন দলিল থেকে জানা গেছে, সে বরাবরই আমাদের বিপক্ষে ছিল।'

'যুদ্ধে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল,' প্রতিবাদ করল বক্সার। 'সবাই দেখেছে, তার গা থেকে রক্ত ঝরছিল।'

'সেটাও ছিল তার পরিকল্পনার অংশ,' চিৎকার করল স্কুয়েলার। 'জোনসের গুলি তার গায়ে কেবল আঁচড় কেটেছিল। সে নিজে গোপন দলিলে লিখেছে একথা। তোমরা চাইলে দলিলগুলো দেখতে পারো, অবশ্য যদি পড়তে পারো। স্নোবলের পরিকল্পনা ছিল, সঠিক মুহূর্তে শত্রুদের সঙ্কেত দিয়ে নিজের গা বাঁচানো। সফলও হয়েছিল প্রায়, কিন্তু আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়নের কারণে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, জোনসের দলবল উঠানে ঢুকে পড়তেই স্নোবল উল্টোদিকে দৌড় দিয়েছিল এবং অনেকেই তাকে অনুসরণ করেছিল? সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল পরাজয় নিশ্চিত। এমন সময় কমরেড নেপোলিয়ন জোনসের পা কামড়ে ধরে চিৎকার করে

উঠেছিলেন, 'মানুষেরা ধ্বংস হোক' বলে, তোমাদের তো সে সব মনে থাকার কথা,' লাফাতে লাফাতে বলল স্কুয়েলার।

তার কথা শুনে জন্তুদের মনে হলো, পুরো ঘটনাটা তাদের চোখের সামনে ভাসছে। মনে পড়ল, সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে স্নোবল পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেবল বক্সারের বিশ্বাস টলল না। 'স্নোবল শুরুতে মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি,' সে ঘোষণা করল। 'গোশালার যুদ্ধে তার ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল।'

'আমাদের নেতা কমরেড নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে টের পেয়েছেন, স্নোবল শুরু থেকেই আমাদের বিপক্ষে ছিল,' জানাল স্কুয়েলার।

'হয়তো,' বলল বক্সার। 'কমরেড নেপোলিয়ন যখন বলেছেন তখন তাই সত্য।'

'এটাই আসল সত্য'। সবাই লক্ষ করল, বক্সারের দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্কুয়েলার। চলে যাবার আগে আবেগপূর্ণ গলায় সে বলল, 'আমি সবাইকে চোখ কান খোলা রাখতে অনুরোধ করছি। আমার ধারণা, আমাদের ভেতর স্নোবলের গুপ্তচর লুকিয়ে আছে।'

চারদিন পর বার্নে সভা ডাকা হলো। সবাই উপস্থিত হবার পর গলায় মেডেল ঝুলিয়ে কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে এল নেপোলিয়ন (সম্প্রতি নেপোলিয়ন নিজেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তুবীর উপাধিতে ভূষিত করেছে)। পুরো সভা স্তব্ধ, নেপোলিয়নের উপস্থিতি প্রমাণ করে—নির্ঘাত খারাপ কিছু ঘটেছে। সবাইকে দেখে নিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়াল নেপোলিয়ন। নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল, সেই শব্দ শুনে কুকুরগুলো ছুটে গেল শুয়োরদের দিকে। চারটে শুয়োরের কান কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এল নেপোলিয়নের সামনে।

শুয়োরগুলোর কান থেকে রক্ত বের হতে লাগল দর দর করে। গন্ধে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল কুকুরেরা। সবাইকে চমকে দিয়ে এরপর তারা আক্রমণ করল বক্সারকে। আক্রমণ ঠেকাতে খুর দিয়ে একটা কুকুরকে মাটিতে ঠেসে ধরল বক্সার। বাকিগুলো ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। কুকুরটাকে মেরে ফেলবে, না ছেড়ে দেবে—নেপোলিয়নের কাছে জানতে চাইল সে। ছেড়ে দেবার হুকুম দিল নেপোলিয়ন। ছাড়া পেয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল কুকুরটা।

ভয়ে কাঁপছিল শুয়োর চারটে, তাদের চোখে মুখে অপরাধী ভাব। এরা হলো সেই শুয়োর, যারা ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার দাবি তুলেছিল। তারা স্বীকার করল, স্নোবলের সাথে তাদের গোপন যোগাযোগ আছে। তার আদেশেই তারা উইণ্ডমিল ধ্বংস করেছে। জন্তুখামার ফ্রেডরিকের হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনাও ছিল তাদের। স্বীকারোক্তি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের

ওপর, দেহ থেকে শুয়োরগুলোর মস্তক আলাদা করে ফেলল। হিম গলায় জানতে চাইল নেপোলিয়ন, আর কেউ তাদের অপরাধ স্বীকার করতে চায় কিনা।

ডিম বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী তিন মুরগি এগিয়ে এল। স্বীকার করল, স্বপ্নে স্নোবল তাদের বিদ্রোহের নির্দেশ দিয়েছিল। শুয়োরদের মত একই পরিণতি হলো তাদেরও। এরপর এগিয়ে এল হাঁসের দল, তারা খাবার চুরি করেছিল। একটা ভেড়া স্বীকার করল, সে খাবার পানিতে প্রস্রাব করেছিল। আরও জানাল, স্নোবলের প্ররোচনায় তারা নেপোলিয়নের অনুগত এক বৃদ্ধ ছাগলকে পুড়িয়ে মেরেছে। একের পর এক অপরাধ স্বীকার ও বিচারের পালা চলল। নেপোলিয়নের পায়ের কাছে জমে উঠল মৃতদেহের স্তূপ। রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

বিচার শেষ হলো। শুয়োর আর কুকুর ছাড়া সবাই ধীরে ধীরে সভাস্থল ত্যাগ করল। সবার মন বিষণ্ন-বিধ্বস্ত। জানে না, কিসে তারা বেশি মর্মাহত- জন্তুদের বিশ্বাসঘাতকতায় নাকি তাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে! আগের দিনগুলোতেও রক্তপাতে তারা বিষণ্ন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ নিজেদের মাঝে ঘটে যাওয়া রক্তপাতের ঘটনায় তারা আহত হয়েছে অনেক বেশি। জন্তুরা উইণ্ডমিলের গোড়ায় একে অপরের গা ঘেঁষে বসে পড়ল—যেন উষ্ণতার সন্ধান করছে।

ক্লোভার, বক্সার, মুরিয়েল, বেনজামিন, হাঁস-মুরগি সবাই। কেবল বেড়াল নেই। সভা শুরুর পর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। সবাই স্তব্ধ, কেবল বক্সারই স্বাভাবিক। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল, লেজ নাড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল, 'আমার কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথাও কোন গোলমাল আছে। বেশি কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল থেকে আমি পুরো এক ঘণ্টা আগে উঠে কাজ শুরু করব।'

পরদিন একাই বিশাল দু'খণ্ড চুনাপাথর গুঁড়ো করল সে। রাত নামার আগেই পাথরের টুকরোগুলো এনে জড়ো করল টিলার গোড়ায়। টিলার গোড়া থেকে পুরো খামারটা দেখা যায়। বিস্তৃত ফসলের খেত চলে গেছে বড় রাস্তা পর্যন্ত, ঘেসো মাঠ, পানির চৌবাচ্চা, ফসলের খেত—কচি সবুজ গম জন্মেছে সেখানে, ফার্ম হাউসের লাল টালির ছাদ, চিমনির কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। বসন্তের সুন্দর বিকেল, ঘাস আর ঝোপগুলো বিকেলের সোনা রোদে ঝলমল করছে।

সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল জন্তুরা—এই খামারটা তাদের! একেবারেই তাদের নিজস্ব সম্পত্তি, তাদের ভালবাসার, পুণ্যভূমি। ক্লোভারের চোখ দুটো জলে ভরে এল। যদি বলতে পারত, তবে সে বলত—এজন্য তারা মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। বুড়ো মেজরের সে রাতের স্বপ্নে এরকম নৃশংস রক্তপাতের কথা ছিল না। তার আঁকা সোনালি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ছিল খিদে ও কষ্টমুক্ত জন্তু জগতের

স্বপ্ন।

যেখানে সবাই সমান, সবাই সাধ্যমত পরিশ্রম করবে, সবলরা দুর্বলদের রক্ষা করবে—সেইরাতে সে যেমন দু'পায়ের মাঝখানে অসহায় হাঁসের বাচ্চাদের জন্য আশ্রয় রচনা করেছিল, তেমনি নিরাপদ হবে তাদের এই জগৎ। তবে এমন কেন হলো? কেন কেউ মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না? হিংস্র কুকুর গর্জায় চারদিকে, বন্ধুদের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটায়! তার নিজের মনে তো কখনও অবাধ্যতার চিহ্ন ছিল না। আর কোন কথা বুঝুক বা নাই বুঝুক, একটা কথা সে খুব ভাল বোঝে, কোনভাবেই আর জোনসের যুগে ফেরা চলবে না। যাই ঘটুক না কেন, সে আগের মতই বিশ্বস্ত থাকবে। নেপোলিয়নের সব নির্দেশ মেনে চলবে আর যথাসাধ্য পরিশ্রম করবে।

এরপর 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গাইতে শুরু করল ক্লোভার। অন্য জন্তুরাও গলা মেলাল তার সঙ্গে। নিচু স্বরে, বিষণ্ন সুরে—এই সুরে গানটা তারা আর কখনও গায়নি। গান গাওয়া শেষ হতেই তিনটে কুকুরসহ হাজির হলো স্কুয়েলার। অত্যন্ত জরুরী একটা কথা বলতে এসেছে সে। কমরেড নেপোলিয়ন এক বিশেষ আদেশ জারি করেছেন, তা হলো, আজ থেকে 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জন্তুরা স্তব্ধ হয়ে গেল। 'কেন?' আর্তনাদ করে উঠল মুরিয়েল।

'এ গানের আর কোন প্রয়োজন নেই,' কঠোর গলায় বলল স্কুয়েলার। 'এটা ছিল বিদ্রোহের গান, বিদ্রোহ শেষ হয়েছে বহুদিন আগে। বিশ্বাসঘাতকরাও নির্মূল হয়েছে। ভেতরের বাইরের সব শত্রুই শেষ। এ গান আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই স্বপ্ন আজ সফল। তাই এই গানের আর কোন প্রয়োজন নেই।'

ভয় পাওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্কুয়েলারের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেড়াগুলো ভ্যা ভ্যা করে উঠল—'চারপেয়েরা বন্ধু, দু'পেয়েরা শত্রু'। বেশ কিছুক্ষণ চলল তাদের চিৎকার। ততক্ষণে জন্তুরা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' এরপর আর কখনও শোনা যায়নি। প্রতি রোববার এর বদলে শুয়োর কবি মিনিমাস রচিত একটা গান গাওয়া হত। গানটা এরকম:

'অ্যানিমেল ফার্ম, অ্যানিমেল ফার্ম
নেভার থ্রো মি শ্যাল্ট দাউ কাম টু হার্ম!'

কিন্তু কেন যেন এই গান 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড'-এর মত জন্তুদের হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে না।

আট

কয়েক দিন পর, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ধকল যখন, কাটিয়ে ওঠা গেল; জন্তুদের কারও কারও মনে পড়ল, জন্তু মতবাদের ছয় নম্বর নীতিটা ছিল 'জন্তুরা একে অপরকে হত্যা করতে পারবে না'। যদিও শুয়োর-কুকুরদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেল না। তবুও তাদের মনে হতে লাগল—কয়েক দিন আগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই নীতি মেলে না। ক্লোভার বেনজামিনকে ছয় নম্বর নীতিটা পড়ে শোনাতে অনুরোধ করল। বেনজামিন পড়তে অস্বীকার করায় সে ধরল মুরিয়েলকে।

মুরিয়েল দেয়ালের লেখাটা পড়ে শোনাল। সেখানে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে—'জন্তুরা একে অপরকে বিনা কারণে হত্যা করতে পারবে না'। কেন যেন তাদের 'বিনা কারণে' কথাটা মনে ছিল না। সবাই স্বস্তি পেল, নিয়ম লঙ্ঘিত হয়নি; স্নোবলের সঙ্গে যোগ দেবার উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে অভিযুক্তরা। গত বছরের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করল জন্তুরা। আবার উইণ্ডমিল বানাল, সেই সঙ্গে খামারের নিয়মিত কাজগুলো করা—সব মিলিয়ে খুবই খাটুনি গেল।

মাঝে মাঝে জন্তুদের মনে হয়, এখন তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে কিন্তু খেতে পায় জোনসের সময়ের মত। এক রোববার সকালে স্কুয়েলার দু'পায়ের মাঝখানে এক কাগজ ধরে রেখে এ বছর উৎপাদিত শস্যের হিসেব পড়ে শোনাল। তার হিসেবে খাদ্য উৎপাদন আগের চেয়ে একশো, দুইশো, তিনশো এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশো গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। জন্তুদের এই তথ্য অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বিদ্রোহের আগে খামারে কি পরিমাণ ফসল ফলত তা কারোই মনে নেই।

সব রকম কাজের নির্দেশ দেয়া হত স্কুয়েলার কিংবা অন্য কোন শুয়োরের মাধ্যমে। নেপোলিয়ন মাসে দু'একবার জন্তু সমক্ষে আসে। যখন আসে, তাকে ঘিরে রাখে কুকুরগুলো। একটা কালো মোরগ সামনে থেকে 'কক্-কক্' শব্দে তার আগমন বার্তা ঘোষণা করে। এখন ফার্ম হাউসেও সে এক ঘরে একা থাকে, একা খায়—সর্বক্ষণ তাকে পাহারা দেয় দুটো কুকুর। দামী বাসনে খায় সে, যেগুলো এতদিন সাজানো ছিল ড্রইং রুমের শোকেসে। ঘোষণা করা হয়েছে, এখন থেকে নেপোলিয়নের জন্মদিনেও তোপধ্বনি করা হবে।

নেপোলিয়নকে এখন আর শুধু নেপোলিয়ন ডাকা হয় না। নামের আগে নেতা, কমরেড যোগ করে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হয়। এ ছাড়া

শুয়োরেরা আরও কিছু বিশেষণ ব্যবহার করে। যেমন 'মানবতার শত্রু', 'ভেড়াদের ত্রাণকর্তা,' 'হাঁসের-বন্ধু' ইত্যাদি। স্কুয়েলার বক্তৃতা দেবার সময় চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে নেপোলিয়নের উদার হৃদয়, জন্তুদের প্রতি তার ভালবাসার কথা বর্ণনা করত।

প্রতিটি সাফল্যের পেছনে নেপোলিয়নের অবদানের কথা স্বীকার করে সবাই। মুরগিরা বলে, 'কমরেড নেপোলিয়নের আশীর্বাদে আমরা ছয়দিনে পাঁচটা ডিম পেড়েছি।' গাভীরা চৌবাচ্চার পানি খেয়ে বলে, 'কমরেড নেপোলিয়নের যোগ্য নেতৃত্বের জন্যই পানি এত মিষ্টি।' জন্তুদের অনুভূতির কথা শুয়োর কবি মিনিমাস তার রচিত 'কমরেড নেপোলিয়ন' নামের এক কবিতায় তুলে ধরেছে এভাবে:

'ফেণ্ড অভ ফাদারলেস
ফাউন্টেন অভ হ্যাপিনেস
অর্ড অভ দ্যা সুইল বাকেট। ওহ্ হাউ মাই সোল ইজ অন
ফায়ার, হোয়েন আই গেজ অ্যাট দাই
কাম অ্যাণ্ড কমান্ডিং আই
লাইক দি সান ইন দ্যা স্কাই।

দাউ আর্ট দ্যা গিভার অভ
অল দ্যাট দাই ক্রিয়েচারস লাভ,
ফুল বেলি টোয়াইস এ ডে, ক্লীন স্ট্র টু রোল আপন
এভরি বিস্টস গ্রেট অর স্মল
স্লীপস্ অ্যাট পীস ইন হিস স্টল
দাও ওয়াচেস্ট ওভার অল কমরেড নেপোলিয়ন।

হ্যাড আই আ সার্কিং পিগ
অর হি হ্যাড গ্রোন অ্যাজ বিগ
ইভেন অ্যাজ আ পাইন্ট বটল অর অ্যাজ আ রোলিং পিন
হি উড হ্যাড লার্নড টু বি
ফেইথফুল অ্যাণ্ড ট্রু টু দ্যা
ইয়েস, হিজ ফার্স্ট স্কুইক ওড বি
কমরেড নেপোলিয়ন।'

কবিতাটা বার্নের দেয়ালে সাত নীতিমালার পাশে বড় অক্ষরে লিখে রাখা হলো। তার ওপর আঁকা হলো সাদা রঙে নেপোলিয়নের ছবি। আঁকল স্কুয়েলার।

ওদিকে মি. হুয়িম্পারের মধ্যস্থতায় মি. ফ্রেডরিক ও মি. পিলকিংটনের সঙ্গে

জটিল আলোচনা চালাচ্ছে নেপোলিয়ন। গাছের গুঁড়িটা এখনও বিক্রি হয়নি। মি. ফ্রেডরিকই কিনতে বেশি আগ্রহী, কিন্তু দাম বলছেন কম। এ সময় গুজব রটে গেল, মি. ফ্রেডরিক জন্তু খামার আক্রমণের ফন্দি আঁটছেন। তিনি নাকি উইণ্ডমিলের ধ্বংস দেখতে চান। আরও জানা গেল, স্নোবল তার আশ্রয়েই আছে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে নেপোলিয়নকে হত্যার নতুন এক 'ষড়যন্ত্র' উদঘাটিত হলো। তিনটে মুরগি এই ষড়যন্ত্রের দায়িত্ব স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

নেপোলিয়নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবার ঢেলে সাজানো হলো। রাতের বেলা তাকে এখন পাহারা দেয় চারটে কুকুর। আর গুয়োর পিংকি তার খাবারে বিষ মেশানো হয়েছে কি না পরীক্ষা করে। কিছুদিন পর সবাই শুনল, মি. পিলকিংটনের কাছে গুঁড়িটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মি. হুয়িম্পারের মাধ্যমে সব আলোচনা চললেও নেপোলিয়ন ও মি. পিলকিংটনের মধ্যে প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। মানুষ হিসেবে সে মি. পিলকিংটনকে অবিশ্বাস করত, কিন্তু মি. ফ্রেডরিককে করত রীতিমত ঘৃণা।

গ্রীষ্মকাল বয়ে চলল, উইণ্ডমিলের কাজও প্রায় শেষের দিকে। জন্তু খামার আক্রমণের গুজবটা দিনে দিনে আরও জোরাল হচ্ছে। শোনা যায়, ফ্রেডরিক বিশজন লোক আর ছয়টা বন্দুক নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুলিস ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছে যাতে সে জন্তু খামার আক্রমণ করলেও তারা কোন ব্যবস্থা না নেয়। আরও শোনা গেল, নিজ খামারের জন্তুদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছে সে। একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলেছে, দুটো গরুকে না খাইয়ে রেখেছে, একটা কুকুরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

বিকেলে মোরগের পায়ে ছুরি বেঁধে দিয়ে মোরগ লড়াইয়ের আয়োজন করছে। স্বজাতির ওপর এমন অত্যাচারের খবর শুনে জন্তুদের রক্ত টগবগিয়ে উঠত। তারা পিঞ্চফিল্ড আক্রমণ করে জন্তুদের মুক্ত করার জন্য নেপোলিয়নের অনুমতি চাইল। কিন্তু স্কুয়েলার তাদের ধৈর্য ধরার উপদেশ দিল। দিনে দিনে ফ্রেডরিকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বাড়তেই লাগল। যে সব কবুতর বিদ্রোহের বার্তা নিয়ে পিঞ্চফিল্ডে যেত; তাদের সেখানে বসতে নিষেধ করা হলো। 'মানুষের মৃত্যু হোক' পোগান বদলে করা হলো, 'ফ্রেডরিকের মৃত্যু হোক'।

গ্রীষ্মের শেষ দিকে স্নোবলের আরেকটা ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল। গমের খেতে অজস্র আগাছা জন্মেছে। তদন্ত করে জানা গেল, রাতের বেলা স্নোবল গমের বীজের সাথে আগাছার বীজ মিশিয়ে রেখে গেছে। রাজহাঁস এই কাজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আত্মহত্যা করল। সবাই এখন বিশ্বাস করে, স্নোবল কখনও 'বীর' উপাধি পায়নি। এটা একটা ভুয়া খবর; সম্ভবত স্নোবল নিজেই

রটিয়েছিল।

যদ্দূর বোঝা গেছে, যুদ্ধের সময় সে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ এ খবরে এখনও অবিশ্বাস পোষণ করে। স্কুয়েলারের মতে, তাদের আসলে সব কথা মনে নেই। শরতের ফসল ঘরে তোলার আগেই উইণ্ডমিলের কাজ শেষ হলো। সব যন্ত্রপাতি অবশ্য জোগাড় হয়নি তখনও। মি. হুয়িম্পার সেগুলো বাজার থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। বাকি সব কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। প্রতি পলে সমস্যা, অনভিজ্ঞতা, স্নোবলের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হলো সব। উইণ্ডমিলের চারধারে ঘুরে ঘুরে জন্তুরা নিজেদের কাজ দেখে নিজেরাই মুগ্ধ। তাদের মতে, প্রথমবারের চেয়ে এবারেরটা বেশি সুন্দর হয়েছে, আর দেয়ালটা গাঁথা হয়েছে দ্বিগুণ পুরু করে। ঝড় কিংবা বিস্ফোরক সহজে এর ক্ষতি করতে পারবে না।

আগের দিনের কথা মাঝে মাঝে ভাবে জন্তুরা। উইণ্ডমিল গড়তে তারা কত কষ্ট করেছে, কতবার নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর এখন! এখন এই উইণ্ডমিলের পাখা ঘুরবে, ডায়নামো চলবে, খামারে আলো জ্বলবে—ভাবতেই এত দিনের ক্লান্তি কোথায় উবে গেল। বুনো উল্লাসে উইণ্ডমিল ঘিরে নাচতে শুরু করল সবাই। নেপোলিয়ন ও কুকুর শোভাযাত্রা সহকারে সেই উল্লাসে যোগ দিল। এরকম একটা মহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাল সে। স্কুয়েলার ঘোষণা করল, উইণ্ডমিলের নামকরণ করা হবে 'নেপোলিয়ন মিল'।

দু'দিন পর বার্নে সভা ডাকা হলো। জন্তুরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে শুনল, নেপোলিয়ন ফ্রেডরিকের কাছে গুঁড়িটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরের দিন ফ্রেডরিকের লোকজন এসে গুঁড়িটি নিয়ে যাবে। সে আগাগোড়া পিলকিংটনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও ফ্রেডরিকের কাছেই গুঁড়িটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফক্স উডের সঙ্গে সব সম্পর্কের ইতি ঘটল, পিলকিংটনের কাছে অপমানজনক বার্তা পাঠানো হলো। কবুতরদের নিষেধ করা হলো ফক্সউডের দিকে যেতে। স্লোগানটা বদলানো হলো আবারও, এবারের স্লোগান—'পিলকিংটনের মৃত্যু হোক'। নেপোলিয়ন জন্তুদের আশ্বস্ত করল, ফ্রেডরিকের আক্রমণের খবর ঠিক নয় আর জন্তুদের ওপর তার অত্যাচারের খবরও ভুয়া। এতদিনে জানা গেল; আসলে পিঞ্চফিল্ডে নয়, স্নোবল লুকিয়ে আছে ফক্স উডে। সেখানে পিলকিংটন তাকে সুখেই রেখেছে।

শুয়োরেরা নেপোলিয়নের বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত, পিলকিংটনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে সে ফ্রেডরিককে গাছের গুঁড়ির দাম বারো পাউণ্ডে তুলতে বাধ্য করেছে।

কিন্তু স্কুয়েলারের মতে তার বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, সে দেখিয়েছে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। সে এমন কি ফ্রেডরিককেও বিশ্বাস করে না। ফ্রেডরিক দাম পরিশোধ করতে চেয়েছিল 'চেক' নামক এক প্রকার কাগজে, যাতে কেবল টাকার সংখ্যা লেখা থাকে। কিন্তু নেপোলিয়নের বুদ্ধির সঙ্গে সে পেরে ওঠেনি। নেপোলিয়ন নগদ টাকা দাবি করল গুঁড়ি সরবরাহের আগে। এই টাকায় উইণ্ডমিলের যন্ত্রপাতি কেনা হবে।

ফ্রেডরিকের লোকজন গাছের গুঁড়ি নিয়ে যাবার পর আরেকটা সভা ডাকা হলো, জন্তুদের নগদ টাকা দেখার সুযোগ দিতে। নেপোলিয়ন জন্তুসুলভ ব্যসনে সজ্জিত হয়ে, বুকে পদক লাগিয়ে খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে, পাশেই চিনা মাটির প্লেটে রাখা টাকা। জন্তুরা সার বেঁধে একে একে টাকা দেখল। বক্সার টাকার কাছে নাক নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল, হালকা পাতলা সাদা রঙের জিনিসটা তার নিঃশ্বাসের হাওয়ায় নড়ে চড়ে উঠল।

তিনদিন পর জানা গেল, মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। মি. হুয়িম্পার ফ্যাকাসে মুখে ফার্ম হাউসে ঢুকলেন। এর কয়েক মুহূর্ত পরই নেপোলিয়নের ঘর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। পুরো খামারে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—ফ্রেডরিকের দেয়া টাকাগুলো জাল! সে জাল টাকা দিয়ে গাছের গুঁড়ি নিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ এক জরুরী সভা ডেকে ফ্রেডরিকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল নেপোলিয়ন। ধরতে পারলে তাকে জ্যান্ত সেদ্ধ করা হবে। এবং আরও একবার সবাই শুনল, ফ্রেডরিক খামার আক্রমণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খামারের চারদিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করা হলো। চারটে কবুতর পিলকিংটনের কাছে গেল বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে। বার্তায় আশা প্রকাশ করা হলো, দুই খামারের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। পরদিন সকালে সত্যি সত্যি আক্রমণ এল। তখন জন্তুরা নাশতা করছে। কবুতরেরা খবর নিয়ে এল ফ্রেডরিকের লোকজন সদর দরজা দিয়ে খামারে ঢোকার চেষ্টা করছে। সাহসের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেল জন্তুরা। কিন্তু এবার আর গো-শালার যুদ্ধের মত সহজে বিজয় এল না। সব মিলিয়ে পনেরো জন লোক, হাতে বন্দুক—খামারের সীমানায় প্রবেশ করা মাত্রই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তারা।

তুমুল গুলির মুখে টিকতে না পেরে জন্তুরা নেপোলিয়ন ও বক্সারের ভরসায় পিছু হটল। ইতিমধ্যে যারা আহত হয়েছে, তারা ফার্মহাউসের পেছনে আত্মগোপন করল। বিস্তৃত ফসলের খেত, উইণ্ডমিল এখন শত্রুদের দখলে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। নেপোলিয়ন পিছিয়ে এসে আশার দৃষ্টিতে তাকাল ফক্সউডের দিকে। পিলকিংটন যদি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে তবে এখনও জয়ের সম্ভাবনা আছে। সেই মুহূর্তে কবুতরেরা ফিরে এল। তারা পিলকিংটনের

কাছ থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। তাতে লেখা—'আমরা তোমাদের পাশে আছি'। এক সময় ফ্রেডরিকের লোকজন উইণ্ডমিল ঘিরে ফেলল। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল জন্তুদের মাঝে। ক্রো-বার আর হাতুড়ি নিয়ে এল দুই শত্রু—পিটিয়েই ভাঙবে তারা উইণ্ডমিল।

'অসম্ভব,' চিৎকার করে উঠল নেপোলিয়ন। 'দেয়ালটা খুব মজবুত, এত সহজে ওটা ধ্বংস হবে না।'

বেনজামিন সতর্ক দৃষ্টিতে লোকগুলোকে লক্ষ করছিল। ততক্ষণে তারা ক্রো-বার আর হাতুড়ির সাহায্যে উইণ্ডমিলের ভিতে একটা গর্ত করে ফেলেছে। বাতাসে কিসের যেন গন্ধ পেয়ে মাথা নাড়ল বেনজামিন। 'যা ভেবেছিলাম,' বলল সে। 'বুঝতে পারছ, কি করছে ওরা? ওই গর্তে এবার বারুদ ভরা হবে।'

আতঙ্কে স্থির হয়ে আছে জন্তুরা, এ পরিস্থিতিতে আড়াল থেকে বের হওয়াও বিপজ্জনক। একটু পর লোকগুলো পড়িমরি করে ছুট্ লাগাল। এরপর শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, কবুতরগুলো বাতাসে কেঁপে উঠল। নেপোলিয়ন বাদে আর সবাই পেটের ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। যখন মুখ তুলল; দেখল, যেখানে উইণ্ডমিল ছিল সেখানে এখন কেবল কালো ধোঁয়ার পর্দা। ধীর বাতাসে সে পর্দা এক সময় সরে গেল কিন্তু উইণ্ডমিলটিকে আর দেখা গেল না।

এই দৃশ্য দেখে জন্তুরা সাহস ফিরে পেল। একটু আগের আতঙ্ক নিমেষে উধাও হয়ে গেল, প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল সবার মনে। কারও নির্দেশের অপেক্ষা না করে একযোগে শত্রুদের আক্রমণ করতে ছুটল সবাই। লড়াইটা হলো জান্তব, জন্তুরা মানুষের কাছাকাছি আসতেই তারা আবার গুলি চালাল। একটা গরু, তিনটে ভেড়া আর তিনটে হাঁস মারা গেল গুলিতে। আহত হলো প্রায় সবাই। এমনকি নেপোলিয়ন; যে আড়াল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল, তারও লেজে গুলি লাগল।

অবশ্য মানুষেরাও অক্ষত রইল না। বক্সারের লাথিতে তিনজনের মাথা ফাটল, একজনের পেটে গরু গুঁতো মারল, জেসী ও ব্লুবেলের আক্রমণে আরেকজনের প্যান্ট ছিঁড়ল। নয়টি কুকুর ঘিরে ধরল মানুষদের। তাদের ভয়ঙ্কর, রক্ত পিপাসু মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল মানুষেরা। ফ্রেডরিক চিৎকার করে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে বলল, পর মুহূর্তে কাপুরুষের মত পালাতে শুরু করল তারা। জন্তুরা খামারের সীমানা পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল, পেছনে থেকে লাথি মেরে কাঁটা ঝোপের উপর ছুঁড়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত ব্যথা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বিজয় এল। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল সব কোলাহল। ঘাসের ওপর বন্ধুদের মৃতদেহ দেখে চোখে পানি এসে গেল সবার। বিষণ্ন মনে উইণ্ডমিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল সবাই, এত পরিশ্রমে

গড়া উইণ্ডমিলের কোন চিহ্নই নেই। এমনকি ভিত্ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এত কষ্টে চূর্ণ করা পাথরের টুকরোগুলোরও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কয়েকশো গজ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে সেসব, দেখে মনে হচ্ছে, এখানে কোন কালেই কোন উইণ্ডমিল ছিল না।

ফার্মে দেখা মিলল স্কুয়েলারের, যুদ্ধের মাঠে তাকে দেখা যায়নি। সে এল লেজ দুলিয়ে লাফাতে লাফাতে। জন্তুরা শুনল, ফার্মের দিক থেকে বন্দুক দাগার শব্দ ভেসে আসছে।

'বন্দুকের শব্দ কেন?' বক্সারের জিজ্ঞাসা।

'বিজয়ের আনন্দ প্রকাশের জন্য,' জবাব দিল স্কুয়েলার।

'কিসের বিজয়?' জিজ্ঞেস করল বক্সার। হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে। ক্ষত থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। খুরের খানিকটা উড়ে গেছে।

'কিসের বিজয় মানে? আমরা কি খামার শত্রু মুক্ত করিনি?'

'কিন্তু ওরা উইণ্ডমিলটা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। গত দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি আমরা ওটা তৈরি করতে।'

'তাতে কি হয়েছে? আবার উইণ্ডমিল তৈরি হবে। দরকার হলে ছয়টা উইণ্ডমিল বানাব। আমরা কত বড় গৌরবের একটা কাজ করেছি। কমরেড নেপোলিয়নের নেতৃত্বে শত্রুর কবল থেকে নিজেদের খামার উদ্ধার করেছি। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য কমরেড নেপোলিয়নের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

'তারমানে, যা আমাদেরই ছিল—তাই আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। তাই না?' অনিশ্চিত গলা বক্সারের, সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'এটাই তো বিজয়,' উৎফুল্ল স্কুয়েলার।

বক্সারের পা ভীষণ ব্যথা করছিল। কল্পনায় নিজেকে নতুন করে উইণ্ডমিল গড়তে দেখল সে। কিন্তু বাস্তবে মনে হলো, তার বয়স হয়েছে। বারো বছরের পুরানো পেশীগুলোতে আর আগের মত জোর নেই। এরপর আবার সবুজ পতাকা উড়ল। সাতবার তোপধ্বনি করা হলো। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য জন্তুদের অভিনন্দন জানাল নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নের অভিনন্দন বার্তা শুনে সবার মনে হলো, তারা সত্যিই বড় রকমের বিজয় অর্জন করেছে। যুদ্ধে নিহত জন্তুদের জন্য গাম্ভীর্যপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা হলো।

বক্সার ও ক্লোভার মৃতদেহগুলো বয়ে চলল। নেপোলিয়ন রইল শবযাত্রার পুরোভাগে। পরের দু'দিন চলল বিজয় উৎসব—নাচ, গান, বক্তৃতা, আর তোপধ্বনি। সবাইকে একটা করে আপেল, পাখিদের দুই আউন্স শস্য আর কুকুরদের তিনটে করে বিস্কুট দেয়া হলো এ উপলক্ষে। যুদ্ধের নাম দেয়া হলো 'উইণ্ডমিলের যুদ্ধ'। নেপোলিয়ন নিজেকে 'সবুজ ফিতে' সম্মানে ভূষিত করল। যুদ্ধ

জয়ের আনন্দে সবাই ফ্রেডরিকের জাল টাকার শোক ভুলে গেল।

ফার্ম হাউসের সেলারে এক কেস হুইস্কি খুঁজে পেল শুয়োরেরা। এতদিন এসবের খোঁজ মেলেনি। সে রাতে ফার্ম হাউসে হৈ চৈ আর বেসুরো গলার গান শোনা গেল। সবাই খুব অবাক হয়ে শুনল নিষিদ্ধ 'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ডের' সুর ভেসে আসছে। রাত সাড়ে ন'টায় নেপোলিয়নকে দেখা গেল পেছনের দরজায়, উঠানে তিড়িং বিড়িং নাচ জুড়ে দিয়েছে সে। কিন্তু পরদিন সকালে ফার্ম হাউসে কারও সাড়া পাওয়া গেল না, কোন শুয়োরের দেখা মিলল না।

বেলা ন'টার দিকে বের হলো স্কুয়েলার, ধীরে ধীরে, টলতে টলতে। তার চোখ ঢুলু ঢুলু, লেজ ঝুলছে আলগা ভাবে—দেখে মনে হচ্ছে বড় রকম অসুখ করেছে। একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিল সে, কমরেড নেপোলিয়ন মৃত্যু শয্যায়। কান্নার রোল পড়ে গেল জন্তুদের মাঝে। অশ্রু ভেজা চোখে একে অপরকে জিজ্ঞেস করল, নেতা চলে গেলে তাদের কি হবে? শোনা গেল, স্নোবল নেপোলিয়নের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বেলা এগারোটায় নতুন ঘোষণা নিয়ে জন্তু সমক্ষে উপস্থিত হলো স্কুয়েলার। কমরেড নেপোলিয়নের শেষ নির্দেশ, মদ পানের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বিকেলের দিকে নেপোলিয়নের অবস্থার খানিকটা উন্নতি হলো। পরদিন সকালে স্কুয়েলার জানাল, কমরেড নেপোলিয়ন আশঙ্কামুক্ত, তিনি দ্রুত সেরে উঠছেন। বিকেলের মধ্যেই নেপোলিয়ন কাজে যোগদান করল। কাজে যোগদানের পরপরই সে মি. হুয়িম্পারকে 'মদ তৈরির প্রক্রিয়া ও বিশুদ্ধকরণ' বইটি কেনার নির্দেশ দিল। এক সপ্তাহ পর ঘোষণা করা হলো, অবসরপ্রাপ্ত জন্তুদের জন্য বরাদ্দকৃত চারণ ভূমিতে বার্লির চাষ করা হবে।

এরই মাঝে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটল, যার অর্থ বুঝল না কেউ। মাঝরাতে উঠানে বেশ গোলমাল শোনা গেল। বিছানা ছেড়ে জন্তুরা উঠানে জড়ো হলো। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। বার্নের দেয়াল, যেখানে নীতিগুলো লেখা ছিল, তার নিচে দু'টুকরো হয়ে পড়ে আছে মই। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান স্কুয়েলার, পাশে উল্টে আছে লণ্ঠন, রঙের ব্রাশ, গড়াগড়ি খাচ্ছে রঙের টিন। কুকুরগুলো দ্রুত ঘিরে ফেলল স্কুয়েলারকে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তাকে পাহারা দিয়ে ফার্ম হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। কি হয়েছে কেউ বুঝল না। শুধু বেনজামিন নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

ক'দিন পর নীতিগুলো পড়তে গিয়ে মুরিয়েল দেখল, সবাই পাঁচ নম্বর নীতির খানিকটা ভুলে গেছে। তাদের ধারণা নীতিটা ছিল—'কোন জন্তু মদ স্পর্শ করবে না'। অথচ এখন সেখানে লেখা 'কোন জন্তু অতিরিক্ত মদ পান করবে না'।

নয়

বক্সারের পা ভাল হতে অনেক দিন লাগল। বিজয় উৎসবের পরপরই আবার নতুন করে উইণ্ডমিল তৈরির কাজে হাত দিল জন্তুরা। বক্সার আহত হলেও বিশ্রাম নিতে অস্বীকার করল। পায়ের ব্যথাটা লুকিয়ে রাখা তার কাছে এখন আত্মসম্মানের ব্যাপার। কেবল গোপনে ক্লোভারকে জানাল সে, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। ক্লোভার ঘাস, লতা-পাতা চিবিয়ে তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। বেনজামিন পরামর্শ দিল কিছু দিন বিশ্রাম নেবার। 'ঘোড়ার ফুসফুসে অতিরিক্ত খাটুনি সহ্য হয় না,' বার বার করে বলল সে। কিন্তু বক্সার কারও কথায় কান দেয় না। তার একটাই আশা, মৃত্যুর আগে নতুন উইণ্ডমিলটা দেখে যাওয়া।

জন্তুদের অবসর গ্রহণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। অবসর গ্রহণের বয়স ঘোড়া ও শুয়োরের ক্ষেত্রে বারো বছর, গরুর চোদ্দ, কুকুরের নয়, ভেড়ার সাত আর হাঁস-মুরগির পাঁচ বছর। বুড়োদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা রাখা হলো। যদিও কোন জন্তু এখন অবসরগ্রহণ করেনি, তবুও ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হলো। বাগানের পেছনের মাঠে বার্লি চাষ করা হচ্ছিল, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, প্রয়োজন মত সেটাকে অবসরপ্রাপ্তদের চারণভূমিতে রূপান্তরিত করা হবে। একটা ঘোড়ার পেনশনের পরিমাণ হবে রোজ পাঁচ পাউণ্ড শস্য, শীতকালে পনেরো পাউণ্ড খড়। ছুটির দিনে একটা আপেল বা গাজর। নিয়ম অনুসারে সবার আগে অবসর গ্রহণ করবে বক্সার। আগামী গ্রীষ্মে তার বারো বছর পূর্ণ হবে।

খামারের জীবন এখন অনেক কঠিন। গতবারের মতই তীব্র শীত পড়েছে, খাদ্য সমস্যা প্রকট। রেশনের পরিমাণ আরও একবার কমানো হয়েছে, শুধু শুয়োর ও কুকুরের বরাদ্দ বাদে। স্কুয়েলারের মতে সবার জন্য একই পরিমাণ রেশন 'জন্তু মতবাদ'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার তথ্যানুযায়ী, খামারে কোন খাদ্যাভাব নেই। স্বল্প সময়ের জন্য কেবল রেশন ব্যবস্থায় একটু হেরফের করা হয়েছে। খামারে সার্বিক পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত।

মাঝে মাঝে জন্তুদের পত্রিকা পড়ে শোনাত সে '—আগের চেয়ে এবারের ফলন অনেক বেশি, এমনকি শালগমগুলোও আগের চেয়ে অনেক বড় আকারের হয়েছে। জন্তুদের এখন আগের চেয়ে অনেক কম কাজ করতে হয়, তাদের গড় আয়ু বেড়েছে, সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। শোবার জন্য প্রচুর খড় মেলে আর পোকা মাকড়ের উপদ্রবও অনেক কমেছে।' জন্তুরা নির্দ্বিধায় স্কুয়েলারের সব কথা

বিশ্বাস করে। সত্যি বলতে কি, জোনসের সময়ের কথা তাদের তেমন মনে নেই। তাদের মনে হয় জীবন সব সময়ই এমন কষ্টের ছিল।

খিদে আর শীতে সব সময়ই তারা কাহিল থাকে। কেবল ঘুমাবার সময়টুকু ছাড়া সব সময়ই কাজ করতে হয়। কিন্তু সন্দেহ নেই, আগের দিনগুলো এর চেয়েও কষ্টের ছিল। তখন তারা ছিল পরাধীন আর এখন সবাই স্বাধীন। এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। স্কুয়েলার জন্তুদের বার বার করে এসব বোঝাত।

খাবার মুখের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শরৎকালে বেশ ক'টা শুয়োর বাচ্চা দিয়েছে। মোট একত্রিশটা বাচ্চা, বিচিত্র তাদের গায়ের রঙ। ঠিক করা হলো, এরপর শুয়োরের বাচ্চাদের জন্য স্কুল তৈরি করা হবে। ততদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন নিজে তাদের বাগানে বসিয়ে পড়তে শেখাবে। অন্যান্য জন্তুদের সাথে শুয়োরের বাচ্চাদের মিশতে নিষেধ করা হলো। নতুন নিয়ম করা হলো, শুয়োরের সঙ্গে দেখা হলে অন্য জন্তুরা রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াবে। শুয়োরদের রোববারে লেজে সবুজ ফিতে পরারও নিয়ম চালু হলো।

আগাগোড়া এ বছরটা ছিল সাফল্যের বছর। যদিও টাকার অভাব ছিল যথেষ্ট। স্কুল তৈরির জন্য ইঁট, কাঠ, বালু আর উইণ্ডমিলের যন্ত্রপাতির জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। তেল, মোমবাতি, নেপোলিয়নের জন্য চিনি (অন্য শুয়োরদের চিনি খাওয়া নিষেধ। কারণ চিনি খেলে মোটা হবার সম্ভাবনা আছে), যন্ত্রপাতি, তার, পেরেক, লোহা, কয়লা আর কুকুরের বিস্কুটও কেনা দরকার। অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজনে কিছু খড় ও আলু বিক্রি করা হলো। সপ্তাহে চারশো'র পরিবর্তে ছয়শো ডিম চালানের ব্যবস্থা নেয়া হলো। ফলে এবছর মুরগিরা খুব কমসংখ্যক বাচ্চা ফোটাতে পারল।

ডিসেম্বরে আরও একবার রেশনের পরিমাণ কমানো হলো। ফেব্রুয়ারিতে আবারও একবার। তেলের খরচ বাঁচাবার জন্য রাতের বেলা বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ করা হলো। সবাই কৃচ্ছতা সাধন করলেও শুয়োরদের আরাম আয়েশের কোন কমতি রইল না। দিনে দিনে তাদের ওজন বাড়তেই লাগল। ফেব্রুয়ারির এক বিকেলবেলা বাতাসে ভেসে এল উষ্ণ, লোভনীয় খাদ্যের সুগন্ধ, এমন লোভনীয় খাদ্যের সুঘ্রাণ জন্তুরা বহুদিন পায়নি। ভাবল, কোন উপলক্ষে হয়তো আজ বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়েছে।

গন্ধটা অনাহার ক্লিষ্ট জন্তুদের আরও ক্ষুধার্ত করে তুলল। কিন্তু খাবার পাত্রে কোন সুস্বাদু, সুগন্ধি খাদ্যের দেখা মিলল না। পরের রোববার জন্তুদের জানানো হলো; বার্লি কেবলমাত্র শুয়োরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শুয়োরদের রোজ এক পাইন্ট করে বার্লি দেয়া হয় আর নেপোলিয়ন পায় আধ গ্যালন। তাকে বার্লি পরিবেশন করা হয় দামী সুপের বাটিতে করে।

জন্তুদের কখনও কখনও মনে হয়, আগের চেয়ে বর্তমান জীবনটাই বেশি কষ্টের। আবার ভাবে, বোধহয় সময়টাই কষ্টের। কিন্তু সব সত্ত্বেও তারা সুখী। কারণ, তারা এখন অনেক সম্মানজনক অবস্থানে আছে। তাছাড়া আনন্দের অনেক আয়োজন, আগের চেয়ে অনেক বেশি গান হয়, বক্তৃতা হয়, শোভাযাত্রা হয়। এরই মধ্যে নেপোলিয়ন সপ্তাহে একদিন আনন্দ শোভাযাত্রার কথা ঘোষণা করল।

সে সময় খামারের সব কাজ বন্ধ থাকবে। জন্তুরা লাইন ধরে মার্চ করবে, সবার আগে থাকবে শুয়োর। তারপর ঘোড়া, গরু, ভেড়া এবং সবশেষে হাঁস-মুরগিরা। কুকুরেরা থাকবে শোভাযাত্রার দু'ধারে। মার্চের নেতৃত্ব দেবে নেপোলিয়ন স্বয়ং। বক্সার আর ক্লোভার সবুজ রঙের শিং-খুর আঁকা একটা ব্যানার বইবে, যাতে লেখা থাকবে কমরেড নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন।

এই নতুন শোভাযাত্রা জন্তুদের মধ্যে খানিকটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। শোভাযাত্রায় নেপোলিয়নের সম্মানে রচিত কবিতা আবৃত্তি করা হলো, স্কুয়েলার শস্য ও খামারের উন্নয়ন সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তব্য রাখল। ভেড়ারা অচিরেই এই অনুষ্ঠানের মহাভক্ত হয়ে উঠল। কারও কারও মনে হলো, এটা নিছক বাড়াবাড়ি, তারা এর প্রতিবাদ করতে চাইল। শুয়োর-কুকুরেরা আশপাশে না থাকলে মৃদু প্রতিবাদ করতও। কিন্তু তা হত কেবলই সময়ের অপচয়, তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

নেপোলিয়নভক্ত ভেড়াগুলো প্রতিবাদকারীকে 'চার পেয়েরা বন্ধু, দু'পেয়েরা শত্রু' বলে চিৎকার করে থামিয়ে দিত। বেশিরভাগ জন্তু এই শোভাযাত্রা পছন্দ করল। গান, শোভাযাত্রা, স্কুয়েলারের লম্বা ফর্দ, তোপধ্বনি, মোরগের ডাক খানিকক্ষণের জন্য হলেও তাদের খিদে ভুলিয়ে রাখল।

এপ্রিল মাসে জন্তু খামারকে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হলো। ফলে শিগ্‌গিরই একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রার্থী ছিল একজনই, নেপোলিয়ন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে জন্তু খামার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলো। একই দিনে স্নোবলের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু নতুন দলিল পাওয়া গেল। এতে নিশ্চিত বোঝা গেল যে, স্নোবল কখনোই জন্তুদের পক্ষে ছিল না। গো-শালার যুদ্ধে সে সরাসরি জোনসের পক্ষে লড়েছে। যুদ্ধের সময় তার স্লোগান ছিল 'মানবতার জয় হোক'। কারও কারও মনে পড়ল, স্নোবলের পিঠ জখম হয়েছিল নেপোলিয়নের কামড়ে।

পা ভাল হবার পর বক্সার আগের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করল। অবশ্য সব জন্তুই সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। নিয়মিত কাজ ছাড়াও আছে উইণ্ডমিলের কাজ। তার ওপর স্কুল বানানোর কাজও শুরু হলো মার্চ মাসে। অপর্যাপ্ত খাবার আর অতিরিক্ত খাটুনি অনেক সময় জন্তুদের অসহ্য মনে হত।

কেবল বক্সারের কোন ক্লান্তি নেই। কথায় বা কাজে কখনও বোঝা যেত না তার বয়েস হয়েছে—শরীরে আগের মত জোর নেই। তার চোখ দুটো উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, দু'কাঁধ ঝুলে পড়েছে।

সবাই বলাবলি করে, বসন্তে নতুন ঘাস গজাবার আগেই বক্সার মারা যাবে। বসন্ত এল, কিন্তু বক্সারের কোন পরিবর্তন হলো না। মাঝে মাঝে পাথর ভাঙতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে মাটিতে ঠেস দিয়ে একটু জিরিয়ে নেয় সে, আর বিড় বিড় করে নিজেকে শোনায় 'আমি আরও বেশি কাজ করব'। ক্লোভার-বেনজামিন তাকে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে বলে কিন্তু বক্সার কারও কথা কানে নেয় না। বারোতম জন্মদিন পেরিয়ে গেল, তবু সে অবসর নিল না।

একদিন বিকেল বেলা শোনা গেল বক্সারের কি যেন হয়েছে। সে একাই অনেকগুলো পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উইণ্ডমিলে। কবুতর খবর নিয়ে এল, 'বক্সার হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে আর উঠতে পারছে না।' খবরটা শোনামাত্র খামারের প্রায় অর্ধেক জন্তু উইণ্ডমিলের গোড়ায় জমা হলো। বক্সার মাটিতে শুয়ে আছে। ঘাড়ে ব্যথা পেয়েছে সে, মাথা তুলতে পারছে না। তার সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে, চোখ জ্বল জ্বল করছে। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। পাশে হাঁটু গেড়ে বসা ক্লোভার ব্যাকুল হয়ে বারবার প্রশ্ন করছে, 'বক্সার! কি হয়েছে তোমার?'

'আমার ফুসফুস,' দুর্বল গলায় জবাব দিল বক্সার, 'অবশ্য তেমন কষ্ট হচ্ছে না। আমার ধারণা, আমাকে ছাড়াই তোমরা উইণ্ডমিলটা শেষ করতে পারবে। এবার আমি অবসর নিতে চাই। বেনজামিনেরও বয়স হয়েছে, সে আমার সঙ্গে অবসর নিলে আমি একজন সঙ্গী পাই।'

'কেউ একজন সাহায্য করো ওকে,' আর্তনাদ করে উঠল ক্লোভার। 'স্কুয়েলারকে খবর দাও।'

সবাই ছুটল স্কুয়েলারকে খবর দিতে। ক্লোভার আর বেনজামিন বক্সারের কাছে বসে তার গায়ের মাছি তাড়াতে লাগল। স্কুয়েলার নেপোলিয়নের কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক বার্তা নিয়ে এল। কমরেড নেপোলিয়ন তার একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী নাগরিকের অসুস্থতায় গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি অবিলম্বে বক্সারকে সুচিকিৎসার জন্য উইলিংডন পশু হাসপাতালে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ও নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তে জন্তুরা অস্বস্তি বোধ করল। মলি ও স্নোবল ছাড়া আর কেউ কখনও খামারের বাইরে যায়নি।

একজন অসুস্থ কমরেডকে মানুষের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হবে—কথাটা কারও ভাল লাগল না। স্কুয়েলার তাদের বোঝাল, এই অবস্থায় একজন পশু চিকিৎসকই বক্সারের সবচেয়ে বেশি উপকারে আসবে। আধঘণ্টা পর একটু সুস্থ বোধ করায় বক্সার স্টলে ফিরল। ক্লোভার আর বেনজামিন তার জন্যে নরম খড়ের

বিছানা তৈরি করে দিল।

পুরো দু'দিন বক্সার স্টলে শুয়ে বিশ্রাম নিল। বাথরুমের তাকে খুঁজে পাওয়া এক বোতল গোলাপী রঙের ওষুধ খেতে দিল তাকে শুয়োরেরা। ক্লোভার নিয়মমত দিনে দু'বার এসে ওষুধটা খাইয়ে যেত। বিকেলে তারা একসঙ্গে, গল্প করত, বেনজামিন লেজ দিয়ে বক্সারের গায়ের মাছি তাড়াত। বক্সার নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী। তার ধারণা, সে শিগ্‌গিরই সেরে উঠবে, কমপক্ষে আরও তিন বছর বাঁচবে। অবসরের দিনগুলোতে বেনজামিনের সঙ্গে মাঠে চরে বেড়াবে। জীবনে প্রথমবারের মত অবসর নিয়ে ভাবার অবকাশ পেল সে। তার ইচ্ছে, বাকি দিনগুলো পড়াশুনা করে কাটাবে, বর্ণমালার সবগুলো অক্ষর শিখে ফেলার প্রচণ্ড ইচ্ছে তার।

একদিন দুপুরবেলা গাড়ি এল বক্সারকে নিয়ে যেতে। জন্তুরা তখন শালগম খেতের আগাছা পরিষ্কার করছে। বেনজামিনকে ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই, চিৎকার করছিল সে—জীবনে এই প্রথম জন্তুরা তাকে উত্তেজিত হতে দেখল। 'শিগ্‌গির এসো সবাই! ওরা বক্সারকে নিয়ে যাচ্ছে।' বেনজামিনের কথা শুনে জন্তুরা শুয়োরদের অনুমতির অপেক্ষা না করে কাজ ফেলে ছুটল। উঠানে বড়সড় বাক্স নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চালক একজন বৌলার হ্যাট পরা ধূর্ত চেহারার লোক। সবাই দেখল, বক্সারের স্টল শূন্য। তুলে ফেলা হয়েছে তাকে গাড়িতে। নিথর শুয়ে আছে বিশালদেহী বক্সার। মাথাটা কাত হয়ে আছে একদিকে। খোলা নিষ্প্রভ চোখ জোড়া চেয়ে আছে তার আকাশে।

গাড়ির চারধারে জড়ো হলো জন্তুরা। 'বিদায় বক্সার' তারা বলল, 'বিদায়।'

'বোকার দল,' মাটিতে পা ঠুকে বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বেনজামিন, 'বোকার দল! গাড়ির গায়ে কি লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ না?'

জন্তুরা চুপ করল। মুরিয়েল গাড়ির গায়ের লেখাগুলো বানান করে পড়তে শুরু করল। তাকে ঠেলে সরিয়ে জোরে জোরে পড়ল বেনজামিন লেখাটা। 'আলফ্রেড সিমণ্ডস্, ঘোড়ার কসাই ও আঠা সরবরাহকারী, উইলিংডন।'

'তার মানে?' প্রশ্ন করল একটি হতভম্ব কণ্ঠ। কে, ঠিক বোঝা গেল না।

'এখনও বুঝতে পারছ না? ওরা বক্সারকে কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছে।'

আর্তনাদ করে উঠল জন্তুরা। এসময় গাড়ি চালক লোকটা চাবুক হাঁকাল, গাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। চিৎকার করে গাড়ির পিছু নিল সবাই। ক্লোভার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল, গাড়ির গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। ক্লোভার চিৎকার করল, 'বক্সার! বক্সার!!' এসময় গাড়ির ছোট্ট জানালায় বক্সারের সাদা ডোরাকাটা নাকটা দেখা গেল পলকের জন্য।

'বক্সার!' ক্লোভার চিৎকার করছে, 'বক্সার! বেরিয়ে এসো, ওরা তোমাকে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে।'

সবাই চিৎকার করছে, 'বেরিয়ে এসো, বক্সার! বেরিয়ে এসো!' কিন্তু গাড়ি ইতিমধ্যে পূর্ণগতিতে চলতে শুরু করেছে। বক্সার তাদের কথা শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। জানালায় তাকে আর দেখা গেল না। কেবল গাড়ির গায়ে তার লাথির আওয়াজ শোনা গেল, সে বেরুবার চেষ্টা করছে। এক সময় বক্সারের দু'একটা লাথিই এই গাড়ি ভাঙার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু হায়! সেই দিন আর নেই। বয়স আর অতিরিক্ত খাটুনি তার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে। জন্তুরা মরিয়া হয়ে গাড়ি টানা ঘোড়াদের কাছে মিনতি করল, 'কমরেড! কমরেড! নিজের ভাইকে তোমরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ো না।'

কিন্তু বোকা অবোধ জন্তুরা সেকথা বুঝল না। কান নাড়িয়ে এগিয়ে চলল নিজ গন্তব্যে। খানিকপর সদর গেট বন্ধ করার বুদ্ধি দিল একজন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে সদর গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে গাড়ি। এরপর বক্সারকে আর কখনও দেখেনি কেউ।

তিনদিন পর জানা গেল, বক্সার উইলিংডনের পশু হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ আর সেবার কোন অভাব হয়নি সেখানে। দুঃসংবাদটা স্কুয়েলার সবাইকে জানাল। সে নিজে, শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথগামী বক্সারের পাশে ছিল।

'বক্সারের মৃত্যুটা দুঃখজনক,' বলল স্কুয়েলার, খুর দিয়ে চোখের পানি মুছল। 'শেষের দিকে তার কথা বলার শক্তি ছিল না। কোনমতে ফিস্ ফিস্ করে বলছিল, উইণ্ডমিলটা দেখে যেতে পারল না বলে তার আত্মা শান্তি পাবে না। "এগিয়ে যাও বন্ধুরা"—সে বলেছিল—"বিদ্রোহের কসম, তোমরা থেমে পোড়ো না। জন্তুখামার দীর্ঘজীবী হোক। কমরেড নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন। কমরেড নেপোলিয়ন সর্বদাই সঠিক।" বন্ধুরা, এই ছিল তার শেষ কথা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল স্কুয়েলার। তারপর তার আচরণ একটু বদলে গেল। কুতকুতে চোখে সন্দেহ নিয়ে এদিক সেদিক তাকাল। তারপর স্থির হয়ে বলল, সে জানতে পেরেছে যে বক্সারের ব্যাপারটা নিয়ে একটা বাজে কথা ছড়িয়েছে জন্তুদের মধ্যে। কেউ কেউ বলছে, যে গাড়িতে করে বক্সারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা নাকি কসাইয়ের গাড়ি; তারা নাকি গাড়ির গায়ে কসাই-এর নাম লেখা দেখেছে।

স্কুয়েলারের বিশ্বাস, এরকম বাজে কথায় কান দেবার মত বোকা নয় কেউ নিশ্চয়ই। সে লেজ নাড়িয়ে এদিক সেদিক চাইল। 'তোমাদের নেতা, কমরেড নেপোলিয়ন এতটা হৃদয়হীন নন। পুরো ব্যাপারটার একটা সরল ব্যাখ্যা আছে।

ঘটনাটা হলো, ওই গাড়িটা আগে ছিল এক কসাইয়ের সম্পত্তি। সম্প্রতি একজন পশু চিকিৎসক তা কিনে নিয়েছেন, কিন্তু গাড়িটা আর নতুন করে রঙ করাননি। তাতেই সবাই ব্যাপারটা ভুল বুঝেছে।'

এ কথায় জন্তুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর স্কুয়েলার বক্সারের হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ের বর্ণনা দিল। হাসপাতালে সে যেসব দামী দামী ওষুধ খেয়েছে, তার দাম দিতে নেপোলিয়ন কোনরকম কার্পণ্য করেনি। জন্তুদের সব সন্দেহ ঘুচে গেল। বক্সার মৃত্যুর আগে উপযুক্ত পরিচর্যা পেয়েছে জেনে জন্তুদের শোক অনেকাংশে লাঘব হলো।

পরের রোববারের সভায় নেপোলিয়ন স্বয়ং উপস্থিত হলো। প্রথমে বক্সারের সম্মানে ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখল সে। জানাল, মৃত কমরেডের দেহ এখন আর খামারে এনে কবর দেয়া সম্ভব নয়। তারচেয়ে বরং বাগানের সমস্ত ফুল দিয়ে গাঁথা বিশাল এক পুষ্পস্তবক উইলিংডনে তার কবরের ওপর রেখে আসা হবে। বক্সারের সম্মানে ভোজের আয়োজন করা হলো। নেপোলিয়ন সেখানে তার বক্তব্য শেষ করল বক্সারের দুটি কথা দিয়ে—'আমি আরও বেশি পরিশ্রম করব'। আর 'কমরেড নেপোলিয়ন সর্বদাই সঠিক'। নেপোলিয়ন আশা করে সবাই এ দুটো কথা মনে রাখবে। পরদিন বক্সারের কবরে দেবার জন্য ফুলের বিশাল স্তবক তৈরি করে শুয়োরেরা উইলিংডন নিয়ে গেল।

ভোজের আয়োজনের জন্য ভাড়া করা গাড়ি উইলিংডন থেকে বড়সড় একটা কাঠের বাক্স পৌঁছে দিয়ে গেল। সে রাতে ফার্ম হাউস থেকে ভেসে এল গানের সুর, আর সেই সাথে ভয়ানক ঝগড়া। এরকম চলল রাত এগারোটা পর্যন্ত। এক সময় শোনা গেল কাঁচ ভাঙার শব্দ, এরপর সব নিস্তব্ধ। পরদিন দুপুরের আগে কেউ ফার্ম হাউস থেকে বের হলো না। পরে জানা গেল—শুয়োরেরা কি করে যেন এক বাক্স হুইস্কি কেনার টাকা জোগাড় করেছে।

দশ

বছর গড়িয়ে যায়, ঋতু বদল হয়, স্বল্পায়ু জন্তুরা পৃথিবী থেকে বিদেয় নেয়। এমন একটা সময় এল, যখন বিদ্রোহের কথা মনে রাখার মত কেউ রইল না। কেবল রইল ক্লোভার, বেনজামিন, মোজেস আর কয়েকটা শুয়োর। মুরিয়েল নেই, ব্লুবেল, জেসি আর পিনশারও মারা গেছে। মি. জোনস মারা গেছেন অতিরিক্ত মদ পানে লিভার পচিয়ে। স্নোবল বিস্মৃত, বক্সারের কথাও কারও মনে নেই। কেবল

জীবিতদের মধ্যে তাকে যারা চিনত তারা ছাড়া। ক্লোভার এখন বুড়ো পেট মোটা ঘোড়া, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা আর চোখের কোণে পিঁচুটি জমেছে।

দু'বছর আগে তার অবসর গ্রহণের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু জন্তুরা আসলে কখনোই অবসর নেয় না। অবসর নেবার পর মনের সুখে মাঠে চরে বেড়াবার নিয়মের কথা কেউ মনে রাখেনি। নেপোলিয়ন এখন চব্বিশ স্টোন ওজনের পরিণত শুয়োর। স্নুয়েলারের শরীরে এত চর্বি জমেছে যে, চোখ মেলে তাকাতেও তার কষ্ট হয়। বুড়ো গাধা বেনজামিন আছে সেই আগের মত, শুধু তার নাক হয়েছে আগের চেয়ে ধূসর। বক্সারের মৃত্যুর পর দিনে দিনে বিষণ্ন আর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে।

খামারে জন্তুসংখ্যা যে হারে বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল, সে হারে বাড়েনি। তবুও সব মিলিয়ে সংখ্যাটা একেবারে কম নয়। পরে জন্মানো জন্তুদের কাছে 'বিদ্রোহ' কেবল মাত্র ইতিহাস। তারা শুধু এর গল্প শুনেছে বুড়োদের মুখে। যে সব জন্তু বাইরে থেকে আনা হয়েছে, তারা এসব কথা আগে কখনও শোনেনি। ক্লোভার ছাড়া আরও তিনটে ঘোড়া হয়েছে খামারে। টগবগে, পরিশ্রমী কিন্তু ভীষণ বোকা। এদের কেউই এ বি ছাড়া অন্য কোন বর্ণ চিনতে শেখেনি।

বিদ্রোহ বা জন্তুমতবাদ সম্পর্কে যা বলা হত, সব তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিত। বিশেষ করে ক্লোভারের কথা। ক্লোভারকে তারা মায়ের মত শ্রদ্ধা করত, কিন্তু তার কথার মানে কতখানি বুঝত, তা বলা মুশকিল।

খামারের অনেক উন্নতি হয়েছে। মি. পিলকিংটনের কাছ থেকে দুটো জমি কেনা হয়েছে, উইণ্ডমিলের কাজ শেষ হয়েছে। এর সাহায্যে ফসল কাটার যন্ত্র ও কপিকল চালানো হয়। অনেক নতুন বিল্ডিং হয়েছে। মি. হুয়িম্পার নিজের জন্য ঘোড়ার গাড়ি কিনেছেন। উইণ্ডমিলের উৎপাদিত শক্তি শস্য ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রচুর টাকা আয় হয়। জন্তুরা আরেকটা উইণ্ডমিল বানানোর কাজে হাত দিয়েছে, এটার কাজ শেষ হলে তা দিয়ে ডায়নামো চলবে।

স্নোবলের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো, গো-শালায় বৈদ্যুতিক বাতি, গরম পানি, সপ্তাহে তিনদিন কাজ—এসব কথা আর শোনা যায় না। নেপোলিয়ন বলেছে, এসব কথা জন্তু মতবাদ বিরোধী। তার মতে কঠোর পরিশ্রম আর মিতব্যয়ীতার মধ্যেই আসল সুখ নিহিত। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, দিনে দিনে খামারের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু জন্তুদের জীবনযাপনের মান সেই আগের মতই রয়ে গেছে—শুধু শুয়োর-কুকুরদের ছাড়া। কারণটা সম্ভবত ওরাই খামারের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতি। তারা খামারের কাজকর্ম করত না। তবে কাজ যে একেবারেই করত না, তা নয়।

তারা খাটত 'ফ্যাশনের' পেছনে। স্কুয়েলার অবশ্য জন্তুদের কাজকর্ম দেখাশোনা করত। শুয়োরদের কাজ সম্বন্ধে তার ব্যাখ্যা কখনোই থামত না। সে বলত, শুয়োররা সারাদিন রিপোর্ট, ফাইল এসব অদ্ভুত জিনিস নিয়ে কাজ করে। এগুলো হলো বড় বড় কাগজ, খুদে অক্ষরে ঢাকা। সাদা কাগজগুলো যখন খুদে অক্ষরে ভরে যায় তখন সে সব আগুনে ফেলে দেয়া হয়। এরই মাধ্যমে নাকি খামারের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। শুয়োর-কুকুরেরা খাদ্য উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং খেতও প্রচুর।

জন্তুরা ভাবত, জীবন মানেই কষ্ট। তাদের সব সময় খিদে লেগেই থাকত। তারা খড়ের গাদায় ঘুমাত, পুকুরের পানি খেত, জমিতে কাজ করত, শীতে কাঁপত আর গ্রীষ্মে মাছির উৎপাত সইত। বুড়োরা আগের দিনের গল্প শোনাত। বিদ্রোহের আগের সময়ের সাথে বর্তমান সময়ের তুলনা করত। অবশ্য তুলনা করার মত তেমন কিছু তারা খুঁজে পেত না। কারণ, সেসব দিনের কথা তাদের প্রায় মনেই পড়ে না। স্কুয়েলারের লম্বা-চওড়া কথার ওপর আর কথা বলত না কেউ। তারা কেবল বুঝত, আগের চেয়ে জীবন এখন অনেক সুখের।

বর্তমানে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, এসব সমস্যার আসলে কোন সমাধান নেই। অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর বেশি সময়ও তারা পেত না। শুধু বুড়ো বেনজামিনের সব মনে আছে। আগের জীবন কেমন ছিল—এখন কেমন চলছে, সব মনে আছে তার। সে জানে, জীবনটা সব সময়ই এমন কষ্টের। খিদে, পরিশ্রম, হতাশা—এরচেয়ে বড় বাস্তব আর কিছু নেই।

কিন্তু জন্তুরা কখনও ভোলেনি তারা স্বাধীন। 'জন্তু খামারই' পুরো ইংল্যাণ্ডের একমাত্র স্বাধীন খামার। প্রতিটি শাবক, অন্য খামার থেকে কেনা জন্তু—সবাই একথা ভেবে উল্লাসিত হত, পত্‌পত্‌ করে উড়তে থাকা সবুজ পতাকার দিকে তাকিয়ে গর্বে তাদের বুক ভরে উঠত। বুড়োরা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলত সেই বীরত্বের কথা, জোনসের বিতাড়ন, সাতটি নীতি, সেই মহান যুদ্ধের কথা—যে যুদ্ধে মানুষেরা পরাজিত হয়েছিল। কোন স্বপ্নই বিফলে যায়নি। জন্তুতন্ত্র, মেজরের সেই স্বপ্ন—'এমন দিন আসবে যে দিন ইংল্যাণ্ডের সবুজ খেতে কোন মানুষের পা পড়বে না, পুরো রাজ্যই হবে জন্তুদের'—এ স্বপ্ন তারা আজও মনের গহীনে লালন করে। হয়তো শিগ্‌গির নয়, বহু বহু বছর পরে হলেও এমন দিন আসবে।

'বিস্টস অভ ইংল্যাণ্ড' গোপনে গোপনে জন্তুদের মনে গুঞ্জন তোলে। যদিও প্রকাশ্যে গাইতে কেউ সাহস পায় না। হয়তো তাদের জীবনটা তেমন সুখের নয়। সব আশা পূরণ হয়নি; তবুও তাদের কোন দুঃখ নেই। তারা জানে, অন্য জন্তুদের চেয়ে তারা কত আলাদা। খিদেয় কষ্ট পেলেও শস্য ফলায় কেবল নিজেদের

জন্য—মানুষের জন্য নয়। তাদের কেউ দু'পায়ে হাঁটে না। কাউকে 'প্রভু' বলে ডাকে না। সবাই সমান এই জন্তুরাজ্যে।

গ্রীষ্মকালে একদিন সকালে স্কুয়েলার ভেড়াদের ডেকে নিয়ে গেল একটা পতিত জমিতে। সেখানে কোন ফসল জন্মে না, কেবল আগাছা। ভেড়াগুলো স্কুয়েলারের তত্ত্বাবধানে সারাদিন আগাছা পরিষ্কার করল। বেলা শেষে ফার্ম হাউসে ফিরল স্কুয়েলার একা, ভেড়াদের রাতে সেখানেই থাকতে বলল। পুরো সপ্তাহ ধরে তারা সেখানে রইল, স্কুয়েলারের অধিকাংশ সময় কাটতে লাগল তাদের পিছনে। অন্যদের সে জানাল, ভেড়াদের একটা নতুন গান শেখানো হচ্ছে।

ভেড়ারা সেদিন বিকেলে ফিরছে, অন্য জন্তুরাও কাজ শেষে ফেরার পথ ধরেছে। হঠাৎ, উঠানের দিক থেকে তীব্র হ্রেষারব ভেসে এল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সবাই পথের ধারে। আবার শোনা গেল হ্রেষারব, গলাটা ক্লোভারের। জন্তুরা লাফিয়ে জড়ো হলো উঠানে, তারপর দেখল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

একটা শুয়োর দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে!

হ্যাঁ, শুয়োরটা হচ্ছে স্কুয়েলার। দু'পায়ে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই উঠানের চারধারে হাঁটছে। কিছুক্ষণ পর, সার বেঁধে ফার্ম হাউস থেকে বেরিয়ে এল সব শুয়োর—দু'পায়ে হাঁটছে সবাই। কেউ টলমল পায়ে, কেউ প্রায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠান ঘিরে চক্কর দিল। এরপর স্কুয়েলারের চিৎকারে আর মোরগের ডাকে নেপোলিয়নের আগমন বার্তা ঘোষিত হলো। চারদিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, রাজকীয় ভঙ্গিতে দু'পায়ে হেঁটে এল নেপোলিয়ন। তাকে ঘিরে রেখেছে ভয়াল দর্শন কুকুরগুলো। তার খুরে একটা চাবুক ঝুলছে।

চারদিকে অটুট নীরবতা। ভীত, বিস্মিত জন্তুরা উঠানে শুয়োরদের চক্কর দেয়া দেখল। তাদের চিরচেনা পৃথিবীতে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। মূর্ত হয়ে উঠল নিস্তব্ধতা। কুকুরের ভয়, দীর্ঘ দিনের নীরব থাকার অভ্যেস, সব যেন ভেসে গেল এক মুহূর্তে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চাইল সবাই। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেড়াগুলো চিৎকার করে উঠল—'চার পেয়েরা ভাল, দু'পেয়েরা আরও ভাল।'

পাঁচ মিনিট ধরে চিৎকার করার পর তারা থামল, ততক্ষণে জন্তুরা প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেছে। শুয়োরেরা আবার মার্চ করে ফার্ম হাউসে ফিরে গেল। বেনজামিন কাঠে নাক ঘষে শব্দ করল। ক্লোভারের চোখ দুটো ভীষণ ম্লান দেখাচ্ছে। কিছু না বলে কেশর নেড়ে ধীরে ধীরে চলল সে বার্নে, যেখানে লেখা আছে জন্তু মতবাদের সাতটি নীতি। কয়েক মুহূর্ত লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল

সে। অপারগ হয়ে বলল, 'আমার দৃষ্টিশক্তি আগের চেয়ে কমে গেছে। আগে এই লেখাগুলো অনায়াসে পড়তে পারতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লেখাগুলো বদলে গেছে। বেনজামিন, নীতিগুলো কি আগের মতই আছে?'

দীর্ঘদিনের মৌনতা ভাঙল বেনজামিন। এগিয়ে এসে লেখাগুলো পড়ল সে। সেখানে এখন সাতটার বদলে কেবল একটা নীতি লেখা। 'সব জন্তুই সমান, কিন্তু তাদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে।'

পরদিন চাবুক হাতে শুয়োরদের কাজের তদারক করতে দেখে অবাক হলো না কেউ। সবাই আরও জানল, শুয়োরেরা এখন প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে, অয়্যারলেস যন্ত্র ব্যবহার করে, তাদের ঘরে টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছে। আরও জানা গেল, নেপোলিয়ন পাইপ টানে। আর শুয়োরেরা মানুষের মত কাপড়-চোপড় পরে। নেপোলিয়ন নিজে পরে কালো কোট, পা'জামা আর পায়ে চামড়ার পট্টি। তার প্রিয় মাদি শুয়োরটি পরে মিসেস জোনসের দামী সিল্কের জামা। এসবের কোন কিছুতেই জন্তুরা অবাক হয় না। মনে হলো, অবাক হবার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

সপ্তাহ খানেক পর, বিকেল বেলা খামারে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি এল। আশেপাশের খামারের মালিকদের 'জন্তু খামার' পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুয়োরেরা তাদের পুরো খামার ঘুরিয়ে দেখাল। পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, বিশেষ করে উইণ্ডমিল দেখে মানুষেরা চমৎকৃত হলো। জন্তুরা তখন শালগম খেতের আগাছা পরিষ্কার করছিল, কেউ মাথা তুলল না—নতমুখে কাজ করে গেল। বোঝা গেল না, কি দেখে তারা বেশি ভয় পাচ্ছে, মানুষ, নাকি চাবুক হাতে শুয়োর?

বিকেল বেলা ফার্ম হাউস থেকে চিৎকার আর উচ্চস্বরের হাসির শব্দ শোনা গেল। সেই সাথে মানুষের কথাবার্তা। কৌতূহলী হয়ে উঠল জন্তুরা, কি হচ্ছে ওখানে? এই প্রথমবারের মত জন্তু আর মানুষ কি এক হয়ে গেল? চুপি চুপি ফার্ম হাউসের দিকে এগোল সবাই।

কেউ কেউ এগোতে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু ক্লোভার তাদের সাহস জোগাল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ফার্ম হাউসের কাছাকাছি গেল সবাই, লম্বা জন্তুরা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। দেখল, বিশাল টেবিলের চারধারে বসেছে দু'জন মানুষ আর ছ'টি শুয়োর। নেপোলিয়ন বসেছে টেবিলের একমাথায়। বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই টেবিলে বসেছে শুয়োরেরা, সবাই মনোযোগ দিয়ে তাস খেলছে। মদ পানের জন্য মাঝখানে একবার বিরতি দেয়া হলো খেলায়। জগ থেকে সবার গ্লাস ভরে দেয়া হলো পানীয়। খোলা জানালায় উঁকি দেয়া জন্তুদের বিস্মিত মুখ কারও নজরে পড়ল না।

ফক্সউডের মালিক মি. পিলকিংটন গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন। পান করার আগে সবার উদ্দেশে ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখলেন তিনি। বললেন, খুব আনন্দের সঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন যে, দীর্ঘ দিনের অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলো আজ। এর আগে তিনি বা অন্য কোন মানুষ জন্তু খামারকে নিজেদের প্রতিবেশী বলে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বদলে শুয়োরেরা খামার চালাচ্ছে, এই অস্বাভাবিকতায় মানুষ অস্বস্তি বোধ করত।

অন্য খামারের মালিকেরা ভাবত, এ ব্যাপারটা তাদের নিজ খামারের জন্তু ও মানুষের ভারসাম্য নষ্ট করবে। কিন্তু সেই সন্দেহের অবসান হয়েছে আজ। মানুষেরা স্বচক্ষে এই খামারের প্রতিটি ইঞ্চি পরিদর্শন করেছে। কি দেখল তারা? শুধু অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতিই নয়, সেই সঙ্গে শৃংখলা ও অধ্যবসায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা অন্য খামারের জন্য উদাহরণ হতে পারে। তার বিশ্বাস, এই খামারের জন্তুরা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে এবং সবচেয়ে কম খাবার পায়। আজ তারা যে সব পদ্ধতি দেখেছে, তার কিছু কিছু তাদের নিজেদের খামারেও চালু করা যেতে পারে।

তিনি তার বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছেন। শেষ করার আগে জন্তু খামারের প্রতি তার বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির কথা পুনরায় ব্যক্ত করলেন। জন্তু খামারের সাথে তার আর কোন গণ্ডগোল নেই। আসলে সব খামারের সমস্যা তো একই, শ্রমিক সমস্যা কম বেশি সবারই আছে। জন্তুদের নিয়ে খানিকটা রসিকতা করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু জন্তুদের তরফ থেকে কোন সাড়া মিলল না। তিনি কোন মতে তার বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, 'আপনাদের সাথে যেমন নিচু শ্রেণীর জন্তুদের বিবাদ আছে, তেমনি আমাদের সাথে আছে শ্রমিকদের।'

টেবিলের চারপাশের সবাই তার বক্তব্যে মৃদু উল্লাস প্রকাশ করল। মি. পিলকিংটন শুয়োরদের আবারও অভিনন্দন জানালেন, খামারের কড়া রেশন ব্যবস্থা, জন্তুদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শ্রম আদায় ও বিশৃঙ্খলাহীন একটা সুন্দর খামার গড়ে তোলার জন্য।

এরপর গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন তিনি। 'জন্তুখামার দীর্ঘজীবী হোক।' উল্লাসধ্বনি ও খুরের শব্দ শোনা গেল। নেপোলিয়ন গর্বিত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে এসে মি. পিলকিংটনের সাথে গ্লাস ঠুকল। উল্লাসধ্বনি স্তিমিত হয়ে এলে নেপোলিয়ন দু'পায়ে ভর করে দাঁড়াল কিছু বলার জন্য।

নেপোলিয়নের বক্তব্য বরাবরই সংক্ষিপ্ত হয়। সে বলল, 'সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়ায় সে নিজেও আনন্দিত। বহুদিন ধরে জন্তু বিদ্বেষী মানুষেরা গুজব রটিয়েছে এখানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। তারা ভাবত, অন্য খামারের

জন্তুদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু এভাবে আসল সত্য চাপা দেয়া যায় না। এখন আমাদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব বুঝতে পেরে সবাই আমাদের সঙ্গে ব্যবসায় আগ্রহী। খামার এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার একমাত্র কৃতিত্ব শুয়োরদের। শুয়োরেরা সম্মিলিতভাবে খামারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।'

তার বিশ্বাস, এখন আর পারস্পরিক সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে সে খামারের কিছু নিয়মের পরিবর্তন করতে চায়। জন্তুদের মধ্যে আগে এক অদ্ভুত প্রথা ছিল, তারা একে অপরকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করত। এই প্রথা আর এখন থেকে চলবে না। আরও একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল, কার যেন মাথার খুলি খুঁটির মাথায় বেঁধে তাকে ঘিরে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হত।

এই নিয়মও আজ থেকে বাতিল ঘোষণা করা হলো। সেই খুলিটা ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অতিথিরা দেখছেন সবুজ পতাকা উড়ছে। নেপোলিয়ন বলল, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে যে আগে পতাকায় সাদা শিং ও খুর আঁকা ছিল—তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন থেকে পতাকা থাকবে পুরোপুরি সবুজ।

মি. পিলকিংটন তার বক্তব্যের একজায়গায় একটু ভুল করেছেন, ধরিয়ে দিল নেপোলিয়ন। মি. পিলকিংটন এই খামারকে সম্বোধন করেছেন 'জন্তু খামার' বলে। 'অবশ্য তার জানার কথা নয়,' বলল নেপোলিয়ন। 'আজ থেকে এই নাম বদলে দেয়া হয়েছে। এখন থেকে এই খামার আবার "ম্যানর ফার্ম" নামে পরিচিত হবে। হাজার হলেও, এটাই তার আদি নাম।'

'ভদ্র মহোদয়গণ। আমরা এখন "ম্যানর ফার্মের" নামে পান করব। ম্যানর ফার্ম দীর্ঘজীবী হোক,' বক্তব্য শেষ করল নেপোলিয়ন।

আগের মতই উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। এক চুমুকে গ্লাস খালি করল সবাই। এই দৃশ্য দেখে জন্তুরা গুঙিয়ে উঠল, যেন ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক কোন দৃশ্য দেখছে সবাই। শুয়োরদের চোখে-মুখে এ কিসের ছায়া? ক্লোভারের ম্লান দৃষ্টি সবার মুখ ছুঁয়ে গেল। জন্তুদের মন কেমন করে উঠল। কি যেন বদলে যাচ্ছে? উল্লাসধ্বনি স্তিমিত হয়ে এল, শুয়োরেরা হাতের তাসের দিকে মনোযোগ দিল। খেলা চলতে লাগল আগের মত। এক সময় নিঃশব্দে পিছিয়ে এল জন্তুরা।

কিন্তু বিশগজ না যেতেই থামতে হলো তাদের। ফার্ম হাউসে চিৎকার আর গোলমাল শোনা যাচ্ছে। আবার জানালায় ভিড় করল জন্তুরা। হ্যাঁ, ভীষণ রকম গোলমাল বেধেছে। চিৎকার, হৈ চৈ, কুটিল চাউনি আর তীব্র প্রতিবাদ চলছে ভেতরে। গোলমাল বেধেছে নেপোলিয়ন ও মি. পিলকিংটনের মধ্যে খেলা নিয়ে।

তারা দু'জন রাগে চিৎকার করছে, দুটো গলার স্বর প্রায় একই রকম। এখন বোঝা যাচ্ছে শুয়োরদের চোখে কিসের ছায়া, কিসের আভাস! জন্তুরা শুয়োর থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের দিকে তাকাল। মানুষ থেকে আবার শুয়োর, শুয়োর থেকে মানুষ। তাদের চোখের সামনে চেহারাগুলো একাকার হয়ে গেল। কোনটা শুয়োর আর কোনটা মানুষ, বোঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

* * *